নিকোলাস রোজারিওর ছেলেরা

শাহরিয়ার কবির

এই পিডিএফটি তৈরি করা হয়েছে -

www.facebook.com/groups/boiloverspolapan ও Banglapdf.net এর সৌজন্যে ।

এটি তৈরি করেছেন - মাহমুদুল হাসান শামীম

Facebook :www.facebook.com/mahmudul.h.shamim

Group:www.facebook.com/groups/boiloverspolapan

Website : Banglapdf.net

নিকোলাস রোজারিওর ছেলেরা

রানু শিবলী

অলংকরণ : রফিকুন নবী

এক নতুন ধরনের ক্যাম্পিং

আমাদের মিশনারি স্কুলের বড়দিনের লম্বা ছুটিগুলো হরেক রকম অনুষ্ঠান আর উৎসবে ঠাসা থাকতো। প্রাইজ দেয়ার দিনের অনুষ্ঠান ছাড়াও কোনও বছর সায়েন্স ফেয়ার, কোনও বছর আনন্দ মেলা আবার কোনও বছর হতো নাটকের প্রতিযোগিতা। এ ছাড়া পিকনিক তো বাঁধা ছিলো প্রত্যেক বছরই। এসব উৎসবে এত মজার মজার ঘটনা ঘটতো যে, তা বলে শেষ করা যাবে না।

নবেম্বরের গোড়াতেই শেষ হয়ে যেতো বছর শেষের পরীক্ষাগুলো। বড়দিনের ছুটি শুরু হতো পরীক্ষার পর। তবে বাইরে থেকে দেখে কারো বোঝার সাধ্যি ছিলো না স্কুলে তখন ছুটির মাস। পরীক্ষার ফল বেরুনো পর্যন্ত রমরম করতো গোটা স্কুল। কোথাও নিখিল স্যার ছেলেদের নিয়ে গানের মহড়া দিচ্ছেন, কোথাও নিকোলাস স্যার নাটক কিম্বা ভ্যারাইটি শোর মহড়া নিয়ে মেতে আছেন আবার কোথাও রহমতুল্লা স্যার পিকনিকের আয়োজন নিয়ে সারা স্কুলে তোলপাড় করছেন।

এসব উৎসবের ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি উৎসাহী ছিলেন ব্রাদার ফিলিপ্স আর ব্রাদার পিটার। তাদের সঙ্গে থাকতেন গানের টিচার নিখিল সূত্রধর আর স্কাউট টিচার নিকোলাস রোজারিও। রহমতুল্লা স্যার পিকনিক ছাড়া অন্য কিছুতে নাক গলাতেন না।

ব্রাদার ফিলিপ্স আর ব্রাদার পিটারকে স্কুলের সবাই আড়ালে ডাকতো ব্রাদার লরেল আর ব্রাদার হার্ডি বলে। সিনেমার লরেলের মতো লিকলিকে ছিলেন ব্রাদার ফিলিপ্স আর তাঁর উল্টো—মোটাসোটা গোলগাল হলেন ব্রাদার পিটার। দুজনেরই সারাক্ষণ হাসি হাসি মুখ, গলায় গলায় ভাব আবার সুযোগ পেলে একজন আরেকজনকে খোঁচাতেও ছাড়েন না। মাঝে মাঝে ঝগড়া করে দু'জন গোমড়া মুখে ঘুরে বেড়ান। ছোটদের আড়ি দেয়ার মতো কথা বলাও বন্ধ থাকে। তখন বুড়ো হেডমাস্টার ব্রাদার জেমসকে নাক গলাতে হতো। তারপর আবার দুজন মানিকজোড় হয়ে ঘুরে বেড়াতেন।

এঁদের ঠিক উল্টো ছিলেন নিকোলাস স্যার আর নিখিল স্যার। সুযোগ পেলেই ঝগড়া করতেন দুজন। শুনেছি নিখিল স্যার নাকি ছোটবেলায় ব্রতচারী করতেন। স্কুলে নতুন এসে ব্রতচারী নাচ-টাচ চালু করতে চেয়েছিলেন। নিকোলাস স্যার শুধু বলেছেন—'ছেলেরা স্কাউটিং করবে, না একধামা চাল, একটা পটল নাচবে?' ব্যস সেই থেকে শুরু।

এ কথা বলতেই হবে নিকোলাস স্যারের জন্য স্কাউটিং-এ আমাদের সুনাম দেশের বাইরে অব্দি ছড়িয়েছিলো। স্কাউটদের ইন্টারন্যাশনাল জাম্বুরিতে আমাদের একজন হলেও যাবে। গেলোবার জোসেফ যেমন গেলো এথেন্সের ওয়ার্ল্ড জাম্বুরিতে।

স্কুলের যে কোনও বিচিত্রানুষ্ঠানে নিকোলাস স্যার তাঁর দলবল নিয়ে ঢুকে পড়তেন। নিখিল স্যার যখন জোরেশোরে মহড়া শুরু করেছেন, তখন তিনি গিয়ে বলতেন আমার ছেলেরা এটা করবে, ওটা করবে—এইসব। 'আমার ছেলেরা' মানে কাব আর স্কাউট মিলিয়ে গোটা স্কুলের শ' দুয়েকের মতো ছেলে। কোরাসের জন্যে হলেও এদের বার দুই তিন স্টেজে তুলবেন। আর ও ছেলেরাও তেমনি—নিকোলাস স্যার বলতে অজ্ঞান।

নিখিল স্যার আমাদের পাইকারি দরে গান শেখাতেন। একেবারে বাঁধাধরা গান। ক্লাস টুতে 'খরবায়ু বয় বেগে,' থ্রিতে 'মেঘের কোলে রোদ হেসেছে', ফোরে 'আমি ভয় করবো না,' তা ফাইভে 'চল চল চল।' সারা বছর এবং বছরের পর বছর একই গান। সপ্তায় একদিন গানের ক্লাস। তিনি এক লাইন গেয়ে শোনান আর ক্লাস সুদ্ধো সবাই গলা মেলায়। তবে বিচিত্রানুষ্ঠানের জন্য তিনি ছেলে বাছাই করে বাছাই করা গান শেখাতেন। নিকোলাস স্যারের ছেলেদের এসব ব্যাপারে দল বেঁধে নাক গলানো তিনি মোটেই পছন্দ করতেন না। যদিও তাঁর বাছাই দলে স্কাউটের সংখ্যা কম থাকতো না।

সেবার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী আর পুরস্কার বিতরণী উৎসব একই দিনে হবে। সারাদিন লম্বা অনুষ্ঠান। নিখিল স্যার ওপরের ক্লাস থেকে গোটা পঁচিশেক ছেলে বাছাই করে কাউকে গান, কাউকে গিটার, কাউকে জলতরঙ্গ, কাউকে আবৃত্তি শিখিয়ে তৈরি করছেন— দেখা গেলো নিকোলাস স্যারের জন্য তাঁর মনমতো কিছু হওয়ার জো নেই। কারণ, নিকোলাস স্যারও তাঁর ছেলেদের নিয়ে তুমুল মহড়া দিচ্ছেন।

ফাংশনের আর মাত্র দিন দশেক বাকি। আমরা স্কাউট আর কাব-রা পাল্লা দিয়ে নাটকের মহড়া শুরু করে দিয়েছি। গোটা চারেক কোরাসের গান ঠিক করেছি, নাইন টেনের বড়রা যন্ত্রসঙ্গীতের মহড়া দিচ্ছে, পেট্রল লিডার জোসেফ ডি কস্টা ওয়ার্ল্ড জাম্বুরির অভিজ্ঞতা বলবে; সব ঠিক করে নিকোলাস স্যার গেলেন নিখিল স্যারের কাছে। পেছনে ফেউয়ের মতো আমরা কজন।

নিখিল স্যার তখন কোরাসে আবৃত্তি শেখাচ্ছিলেন। নিকোলাস স্যারকে দেখে হঠাৎ—'হয়নি, হয়নি, এখানটায় সলো হবে, ফটকে সব গুলিয়ে ফেলেছে,' বলে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

নিকোলাস স্যার বেশ গম্ভীর গলায় বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা ছিলো নিখিল স্যার।'

'কী কথা বলুন। তোরা থামলি কেন? আবার শুরু থেকে—। হাবলা তোর গলা এত চড়াবি না—' বলে নিখিল স্যার আবার আবৃত্তি নিয়ে ব্যস্ত হলেন।

'আমি প্রোগ্রাম নিয়ে কিছু কথা বলতে চাই।' নিকোলাস স্যার আরো গম্ভীর হয়ে বললেন।

নিখিল স্যারের ছেলেরা ততক্ষণে কোরাসে 'ভগবান তুমি যুগে যুগে দূত—' শুরু করে দিয়েছে। নিখিল স্যার একটু বিরক্ত হয়ে নিকোলাস স্যারকে বললেন, 'কী বলবেন

ঝটপট বলুন।' তারপর গলা তুলে আমানুল্লাকে ধমক লাগালেন,-'কী হলো তোর, গলায় কি ব্যাঙ আটকেছে, অমন গাঁক গাঁক করছিস কেন?'

'ওদের সঙ্গে কথা বললে আপনি আমার কথা শুনবেন কিভাবে?' নিকোলাস স্যার চেষ্টা করেও নিখিল স্যারের মুখ ফেরাতে পারলেন না।

আরো বিরক্ত হয়ে নিখিল স্যার বললেন, 'আমি কান দিয়ে কথা শুনি। সাপের মতো জিব দিয়ে কথা শুনি না। কী বলবেন বলে আমায় রেহাই দিন।'

'আমার ছেলেরা একটা একাঙ্ক নাটক করবে, চারটা কোরাস রেডি করেছে, যন্ত্রসঙ্গীতের একটা আইটেমও আছে ওদের। আর জোসেফ বলবে এথেন্সের অভিজ্ঞতা'। গড় গড় করে ফিরিস্তি শুনিয়ে একটু থামলেন নিকোলাস স্যার—'আশা করি কোন আইটেমের পর কী হবে আপনি ঠিক করে দেবেন।'

'তোরা একট থাম তো।'—বলে নিখিল স্যার মুখ ফিরিয়ে নিকোলাস স্যারের দিকে তাকালেন। ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আমার ধারণা ছিলো ভ্যারাইটি শো-তে কে কী করবে, প্রোগ্রাম কী হবে, সেটা ঠিক করার দায়িত্ব আমার। আপনি কি বলবেন নিকোলাস স্যার, কখন থেকে এ দায়িত্ব আপনাকে দেয়া হয়েছে?'

'দায়িত্ব আপনারই'। শান্ত গম্ভীর গলায় নিকোলাস স্যার বললেন, 'প্রত্যেক বছর আমার ছেলেরা অনুষ্ঠান করে। অন্যান্যবার আপনি বলেন। এবার বলেননি দেখে আমার ছেলেরা কী করবে সেটা আমি ঠিক করেছি।'

'যা খুশি একটা ঠিক করলেই তো হয় না।' মিহি গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন নিখিল স্যার—'আমার ছেলেরা কি ঘাস কাটার জন্য এক মাস ধরে মহড়া দিচ্ছে?'

'আমার ছেলেরা এক মাস নয়, সারা বছর মহড়া দেয়।' এবার রেগে গেলেন নিকোলাস স্যার—'ঢের শুনেছি আপনার ওসব প্যানপ্যানে গান। ওগুলো মেয়েদের স্কুলেই ভালো মানায়। আমার ছেলেরা গাইবেই।'

'বললেই হলো!' আরো সরু গলায় চ্যাঁচালেন নিখিল স্যার—'স্কুলে কি কোনও ডিসিপ্লিন নেই? আমি আজই ব্রাদার ফিলিক্সকে বলবো।'

'ব্রাদার পিটার নিশ্চয়ই স্বর্গে যান নি! তিনি খুব ভালো করেই জানেন আমার ছেলেরা কেমন গায়।'

এ ধরনের পরিস্থিতিতে ব্রাদার ফিলিক্স সব সময় নিখিল স্যারের পক্ষ নিতেন আর ব্রাদার পিটার সমর্থন করতেন নিকোলাস স্যারকে। সেবার নিকোলাস স্যারের কপাল মন্দ। কদিন আগেই ব্রাদার পিটার গিয়েছেন বান্দুরা। আর ব্রাদার ফিলিক্স ঠিক তখনই কোথায় যেন যাচ্ছিলেন। নিখিল স্যারের গলা শুনে এদিকে এলেন।

রেগে গেলে ফর্শা গোলগাল নিখিল স্যারের চেহারাটা দেখে হাসি চেপে রাখা দায়। গোল গাল চোখ দুটো মার্বেলের মতো ঘুরতে থাকে, ঘন ঘন মাথা নাড়েন। আমরা সবই জিভ কামড়ে হাসি চাপতে ব্যস্ত। ব্রাদার ফিলিক্স ঠোঁটের ফাঁকে হাসি চেপে ভুরু কুঁচকে কাছে এসে বললেন, 'কী হইয়াসে নিখিল স্যার। আপনি এত রাগিয়ে গিয়াসেন ক্যান?'

'আপনিই বলুন ব্রাদার! ভ্যারাইটি শো-র প্রোগ্রাম ঠিক করবো আমি। ষোল আনা দায়িত্ব আমার ওপর, কিছু হলে হেডমাস্টার আমাকে ধরবেন। মাঝখান থেকে নিকোলাস

স্যার এসে বলছেন তাঁর ছেলেরা দু' ঘন্টা স্টেজ জুড়ে কি সব ছাইপাঁশ করবে।'

'দু'ঘন্টা নয়, সব মিলিয়ে এক ঘন্টা দশ মিনিট হবে। তিন ঘন্টার ভিতর এই সময় টুকু আমার ছেলেদের জন্য চেয়েছি। ওরা ছাইপাঁশ করে—একথা নিখিল স্যারের মুখে আমি প্রথম শুনলাম।

'এ্যদ্দিন বলিনি ভদ্রতা করে।' নিখিল স্যার চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'একশটা ছেলে কোরাস গায়, একটারও যদি গলা মেলে। ওসব খোলা মাঠের হট্টগোলে চলতে পারে। অডিটোরিয়ামের ভেতর গার্জেন আর গণ্যমান্য গেস্টদের সামনে স্টেজে দেয়ার জিনিস নয়।' তারপর হুঙ্কার দিলেন—'ওসব হবে টবে না'।

ব্রাদার ফিলিক্স হাসি চেপে আকাশের দিকে তাকিয়ে নিকোলাস স্যারকে বললেন, 'আপনার ভালো না লাগিলেও একথা আমাকে বলিতেই হইবে নিকোলাস স্যার, ভ্যারাইটি শো-এর বিষয়ে নিখিল স্যার যা বলিবেন উহা সকলকে মানিয়ে চলিতে হইবে।' একটু থেমে যোগ করলেন, 'ব্রাদার পিটার থাকিলে তিনিও এই কথা বলিতেন।'

নিখিল স্যার যুদ্ধে জেতা সেনাপতির মতো চিবুক উঁচিয়ে তাকালেন নিকোলাস স্যারের দিকে। গর্বিত গলায় বললেন, 'আপনার ছেলেদের আমি দুটো কোরাস গাইতে দিতে পারি। তাছাড়া জোসেফ আর ক'জন তো আমার নাটকেই আছে।'

নিকোলাস স্যারের নরোম কালো মুখ বেগুনি রঙের হয়ে গেলো। কালো মোটা ফ্রেমের চশমার ভেতর মায়াভরা নিষ্পাপ চোখ দুটো মলিন মনে হলো। আমরাও ব্রাদারের কথা শুনে ভারি দুঃখ পেলাম। বলার কিছুই নেই। কারণ, তিনি সত্যি কথাই বলেছেন। ব্রাদার ফিলিক্স নিরীহ গলায় নিকোলাস স্যারকে বললেন, 'আপনার পোলারা ক্যাম্পিং-এ যাউক না। উহারা নিখিল স্যাররে বিরক্ত করিতে আসে ক্যান।' তারপর মুখ টিপে হেসে চোখ মটকালেন—'উহাদের গান ক্যাম্প ফায়ার না হইলে জমে না।'

ব্রাদারের কথা শুনে নিখিল স্যার খিক খিক করে ভুঁড়ি দুলিয়ে হাসলেন আর আমরা সবাই চটেমটে একাকার। না হয় আমরা একটু বেসুরো গাই। কোরাসে একশ ছেলেরা গলা মেলানো চাট্টিখানি কথা তো নয়।

ব্রাদার ফিলিক্স চলে যেতেই ক্লাস নাইনের প্যাট্রিক বললো, 'আমাদের বাদ দিলে ফাংশনে যে কুকুর বেড়াল ডাকবে। ওসব কি নিখিল স্যার সামলাতে পারবেন?'

প্যাস্থার পেট্রলের শিবলী বললো, 'আমরা ফাংশন বয়কট করবো।'

'না'। নিকোলাস স্যারের মুখে রহস্যের হাসি। 'আমরা ব্রাদার ফিলিক্স-এর পরামর্শ মতো ক্যাম্পিং-এ যাবো। এই বলে তিনি আমার দিকে তাকালেন— 'যাও আরিফকে বলো, পেট্রল লিডারদের কাউন্সিলের জরুরি মিটিং ডাকতে।'

নিকোলাস স্যার কী ভেবে অমন রহস্যময় হেসে ক্যাম্পিং-এর কথা বললেন, তখন কিছুই বুঝিনি। এমন কি একগাল হেসে ব্রাদার ফিলিক্সকে যখন আমাদের অতিথি হয়ে সঙ্গে যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন তখনও বুঝিনি সেই হাসির রহস্য। তবে ব্রাদার ফিলিক্সকে বলা মাত্রই তিনি—'অবশ্যই যাইব, অবশ্যই যাইব,' বলে আহ্লাদে আটখানা হলেন।

স্কাউটদের ক্যাম্পিং-এ যাওয়া মানে দল বেঁধে জঙ্গলে গিয়ে তাঁবুর তলায় থাকা।

নিজেদের রান্না আর সব কাজ নিজেরা করা—সেই ফাঁকে নানারকম ট্রেনিং, যেগুলো যুদ্ধের সময় ছোটদের দরকার হতে পারে। কে না জানে স্কাউটদের যুদ্ধের সময় কী রকম ঝুঁকি নিয়ে চিঠিপত্র আনা নেয়া করতে হয়, শত্রু শিবিরের খবর আনতে হয় আর গোপন সব সংকেত পাঠাতে হয় নিজেদের লোকদের। ক্যাম্পিং-এ যাওয়ার কথা শুনে বলা বাহুল্য সবারই রোমাঞ্চ হলো।

আমাদের ফিফ্‌থ ঢাকা ট্রুপে তখন সব মিলিয়ে বারোটা পেট্রল। প্রত্যেক পেট্রলে আটজন করে স্কাউট, যার একজন হচ্ছে পেট্রল লিডার। আমি তখন ক্লাস নাইনে উঠেছি, উলফ পেট্রলের এসিসটেন্ট পেট্রল লিডার। আমাদের লিডার ছিলো ক্লাস টেনের এনামুল হাসান। বেশির ভাগ পেট্রল লিডার ক্লাস টেনের ছাত্র। পাঁচজন ছিলো ক্লাস নাইনের। সিক্সে না উঠলে স্কাউট হওয়া যেতো না। আমার পেট্রলে শুধু পনির ছিলো ক্লাস সিক্সের।

নিকোলাস স্যারের কথা মতো ট্রুপ লিডার আরিফ চৌধুরীকে বললাম মিটিং ডাকতে। আমার কথা ওর বিশ্বাস হলো না। 'কাল বিকেলেই তো মিটিং ডাকলাম। আজ আবার কী হলো?'—এই বলে ছুটলো নিকোলাস স্যারের কাছে।

একটু পরেই হাঁপাতে হাঁপাতে ছুটে এলো আমাদের ট্রুপ লিডার। আমাকে ডেকে বললো, 'হ্যাঁরে নিখিল স্যারের সঙ্গে নিকোলাস স্যারের কী হয়েছে রে। তুই নাকি সব শুনেছিস?'

যা শুনছি সব বললাম। আহ্লাদে আটখানা হয়ে ট্রুপ লিডার বললো, 'এবারের ক্যাম্পিংটা জমাতে হয় তাহলে! জো কোথায়? ওকে ডেকে দিয়ে তোরা বাড়ি যা। খেয়ে দেয়ে বিকেলে আসিস।'

পেট্রল লিডারদের ভেতর ক্লাস টেন-এর জোসেফ ডি কস্টা ছিলো সবচেয়ে রাশভারি। এরই ভেতর এথেন্স ছাড়া ইস্তাম্বুল, লাহোর আর কলম্বো ঘোরা হয়ে গেছে তার। নিকোলাস স্যার পর্যন্ত ওর সঙ্গে সমীহ করে কথা বলতেন। খুঁজে দেখি গির্জার সিঁড়িতে বসে দুজন কথা বলছেন। নিকোলাস স্যার গম্ভীর হয়ে বলছিলেন, 'এবারের ক্যাম্পিং স্পট হিসেবে মৌচাক সম্পর্কে তোমার কি ধারণা জোসেফ? নাকি শালনা যাবো?'

নাকের ডগায় নেমে আসা চশমাটা ঠিক করে জোসেফ গম্ভীর গলায় বললো, 'নতুন কোন জায়গার কথা ভাবলে হয় না? আমি অন্য একটা ট্রেনিং-এর কথা ভাবছিলাম।'

আমি বললাম, 'জো ভাই, তোমাকে আরিফ ভাই ডাকছে।'

নিকোলাস স্যার মাথা নেড়ে সায় জানালেন—'এ বিষয়ে আমরা পরে কথা বলবো জোসেফ। তুমি বরং আরিফের সঙ্গেও এ নিয়ে কথা বলো।' এই বলে নিকোলাস স্যার উঠে দাঁড়িয়ে আমার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলেন—'ক্যাম্পে যাওয়া নিশ্চয়ই নিখিল স্যারের ফাংশনের চেয়ে ভালো হবে।'

আমি আহ্লাদে গলে গিয়ে বললাম, 'অনেক মজা হবে।'

'এবার তাহলে তোমরা ঘুরঘুর না করে বাড়ি চলে যাও।' মোলায়েম গলায় বললেন নিকোলাস স্যার—'তোমার ভাই নিখিল স্যারের সঙ্গে রিহার্সাল দিচ্ছে দেখলাম।'

দুপুরে ভাইয়া আর আমি বাড়ি এসে খেয়ে যাই। ভাইয়া ম্যাট্রিক দেবে। গিটার বাজাতে জানে বলে নিখিল স্যার ওকে ভারি আদর করেন। সিক্স-সেভেনে থাকতে কিছুদিন স্কাউটিং করেছিলো। ভালো লাগেনি বলে ছেড়ে দিয়েছে। ওর ওই স্বভাব। কোন কিছু বেশিদিন করতে পারে না। স্কাউটিং ছেড়ে কিছুদিন গান শেখার জন্য বাফায় গিয়েছিলো। গান ছেড়ে এখন গিটার ধরেছে। দিদা বলেন, গিটার ছাড়তে আর ছ' মাস বাকি।

ভাইয়াকে খুঁজতে নিখিল স্যারের মহড়ার ঘরে এলাম। কেউ নেই সেখানে। রাগ করে সবাই বোধ হয় বাড়ি চলে গেছে। আমিও একা বাড়ির পথে পা বাড়ালাম।

স্কুল থেকে আমাদের রূপচাঁদ লেনের বাড়িটা মাত্র দশ মিনিটের পথ। আসার পথে হাজারীর কেবিনে দেখি ভাইয়া ওদের ক্লাসের ক'টা বখাটে ছেলের সঙ্গে বসে চা খাচ্ছে। জানতাম আজ ওকে ওখানে দেখবো। ক্লাস নাইনে দুবার ফেল করা ফেলু মাস্টার খনুদা আমাকে দেখে বললো, 'এই যে গুড বয়, খাবে নাকি এক কাপ চা। নিখিল স্যারের প্যাঁদানি কেমন লাগলো?'

ভাইয়া ভুরু কুঁচকে আমার দিকে তাকালো। বয়ে গেছে ওদের সঙ্গে চা খেতে। আমি কোন কথা না বলে চলে এলাম। জানি আজও ভাইয়ার কপালে বাবার পিটুনি আছে। দিদা যখন সন্ধ্যের পর বাবাকে বলেন ভাইয়ার সারাদিনের ফিরিস্তি—দুপুরে খেতে আসেনি, কিম্বা রাস্তার ছেলেদের সঙ্গে মার্বেল আর লাট্টু খেলেছে, বাবা তখন খড়ম দিয়ে ওর পিঠের ওপর দু'ঘা বসাবেনই। ওই দু'ঘা খেয়েই ও এমন জোরে চেঁচায় কেউ না জানলে ভাবে বাড়িতে বুঝি ডাকাত পড়েছে।

দিদা আমাকে খেতে দিয়ে বললেন, 'বড় কর্তা বুঝি এলেন না! নিশ্চয়ই হোটেলের বাসি পচা খেয়ে পেট ভরাচ্ছেন?'

আমি অম্লান বদনে বলে দিলাম, 'হাজারীর কেবিনে বসে সিঙাড়া খাচ্ছে।'

'খাওয়াবো ভালো করে।' দিদা চিবিয়ে চিবিয়ে বললেন, 'আজ আমি নিজে ওর পিঠে আস্ত খড়ম ভাঙবো।'

ছোটবেলায় মা মারা যাওয়ার পর গ্রামের বাড়ি থেকে দিদা এসে আমাদের তিনজনের ছোট সংসারটির ভার নিয়েছেন। বাবা সকালে কাজে যান। সন্ধ্যের পর বাড়ি ফেরেন। তখন তাঁর মেজাজ থাকে চড়া। ভাইয়ার কথা দিদা যে সব সময় বাবাকে বলেন তা নয়। তবে হোটেলে খাওয়ার কথা শুনলে তিনি নিজেই মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে পারেন না। তাই না বলে পারেনও না। আর আমিও হাজারীর কেবিনে ভাইয়াকে দেখলেই দিদাকে এসে বলে দিই। কারণ যেদিন ও কেবিনে আড্ডা দেয়, বুঝতে হবে সেদিন সকালে স্কুলে যাওয়ার পথে আমার মাথায় গাট্টা মেরে টিফিনের পয়সাগুলো নিয়ে গেছে। ওর মার্বেল কেনার পয়সাও আমাকে জোগাতে হয়। আমার কোনও কথাই শুনবে না। ওর গায়ে জোর বেশি বলে এসব ব্যাপারে দিদাকে জানানো ছাড়া আমার কিছুই করার থাকে না।

দুপুরে খাওয়ার পর দিদা ওঁর ঘরে বিছানায় শুয়ে রোজকার মতো ফর ফর করে নাক ডাকা আরম্ভ করেছেন। আমিও সুযোগ বুঝে পা টিপে বেরিয়ে এলাম। সন্ধ্যে বেলা

দিদার ঘুম থেকে জেগে ওঠার আগেই ফিরে আসা যাবে।

চারটায় স্কুলে এসে দেখি আমাদের পেট্রল লিডার আর এ্যাসিসটেন্টরা সবাই এসে গেছে। শুধু নিকোলাস স্যারকে কোথাও দেখলাম না। সবাই মিলে টেনিস কোর্টে বসলাম গোল হয়ে। টিটকিরি মারার জন্য নিখিল স্যারের ছেলেদের কাউকে আশেপাশে দেখা গেলো না।

ট্রুপ লিডার আরিফ বললো, 'আমরা ক্যাম্পিং-এ যাচ্ছি তোমরা সবাই এরই মধ্যে নিশ্চয়ই জেনেছো। এ বিষয়ে জো তোমাদের বিস্তারিত বলবে।'

নাকের ডগায় নেমে আসা চশমাটা ওপরের দিকে ঠেলে দিয়ে জোসেফ বললো, 'তোমরা এর আগে কয়েকবারই ক্যাম্পিং-এ গিয়েছো। গতবার যাওয়া হয়েছিলো মৌচাকে, তার আগের বার জয়দেবপুরে, একবার শালনাও যাওয়া হয়েছে। তোমরা যারা টেণ্ডারফুট বা সেকেণ্ড ক্লাস স্কাউট তারা জঙ্গলের ভেতর ট্র্যাকিং করতে জানো কিন্তু লোকালয়ে ট্র্যাকিং ফলো করে কিভাবে কোথায় যেতে হয় সেটা জানো না। যুদ্ধের সময় ট্র্যাকিং যদি ঠিক মতো ফলো করতে না পারো তাহলে দেখা যাবে একজনের ভুলের জন্য একটা গোটা কোম্পানি বা রেজিমেন্ট ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই এবারে ক্যাম্পিং-এর ট্রেনিং শুরু হবে ব্যস্ত লোকালয়ে ট্র্যাকিং ফলো করার ভেতর দিয়ে। গোটা ট্রুপ এবার এক সঙ্গে যাবে। তবে ক্যাম্প লাইফের অন্যান্য ট্রেনিং আগের মতোই থাকবে। যাতে করে যুদ্ধ বা জরুরি অবস্থার জন্য আমরা সব সময় তৈরি থাকতে পারি।'

সামরিক বাহিনীর একজন যোগ্য অধিনায়কের মতোই বক্তৃতা দিচ্ছিলো জোসেফ। শেষ করে জানতে চাইলো—'কারো কোনো প্রশ্ন আছে?'

পেট্রল লিডার শওকত বললো, 'যাবো কিভাবে, বাসে না অন্য কিছুতে?'

'হেঁটে।' এক কথায় জবাব দিলো জোসেফ।

জার্নি টেস্ট না হলে সাধারণত পুরো রাস্তাটা আমরা বাসে যাই। ক্যাম্পিং স্পটের কাছে পাঁচ ছয় মাইলের ভেতর এনে আমাদের নামিয়ে দেয়া হয় বাস থেকে। তখন পেট্রলগুলো আলাদাভাবে ট্র্যাক অনুসরণ করে বিভিন্ন দিক দিয়ে আসল জায়গায় পৌছোয়। পুরো রাস্তা হেঁটে আগে কখনো ক্যাম্পিং-এ যাইনি।

জোসেফের কথা শুনে আমরা একে অপরের মুখের দিকে তাকালাম। শহরের আট দশ মাইলের ভেতর কোন ক্যাম্পিং স্পট আছে বলে তো শুনিনি কখনো। সাধারণত কোন বনের পাশেই ক্যাম্প করা হয়। এ বার হচ্ছেটা কী? ট্রুপ লিডার আরিফের দিকে তাকালাম। মুখ টিপে হেসে ও আকাশ দেখতে লাগলো। জোসেফকেও ততোটা গম্ভীর মনে হলো না। বললো, 'আমরা পরশু ভোরে রওনা দেবো। কাল পেট্রল লিডার আর এ্যাসিস্টেন্ট লিডাররা এসে ডেন থেকে জিনিসপত্র বের করে গুছিয়ে রাখবে। সঙ্গে কী কী নিতে হবে ছেলেদের বলে দেবে।'

একের পর এক শুধু বাধা

পিকনিকে যাওয়া নিয়ে অনেক সময় আপত্তি করলেও বাবা ক্যাম্পিং-এ যেতে কখনো বাধা দেন না। তাঁর হিসেব খুব সোজা। বলেন, 'পয়সা অত সস্তা নয়, ফুর্তি করার জন্য একদিনে পাঁচ টাকা ওড়াতে হবে। ক্যাম্পে দশ টাকা লাগলেও ওখানে কিছু শিক্ষা হয়।'

তখন পাঁচ দশ টাকাতেই ক্যাম্প, পিকনিক হয়ে যেতো। হবে না কেন? একটা বড় মুরগির দাম দুটাকার বেশি ছিলো না। ভালো বাসমতি চাল বারো আনা সের। স্কুলে টিফিনের জন্য ক্লাস সেভেনে ওঠার পর রোজ দুআনা করে পেতাম, তাই দিয়ে দুটো বড় বড় পেয়ারা নয় তো এক ছটাক নকুলদানা কিনে খেতাম মিয়ার দোকান থেকে। ভোলানাথের দোকানে নারকেলের সন্দেশ পাওয়া যেতো দু'পয়সা দামে।

বাবা কাগজিটোলার এক ছাপাখানায় ম্যানেজারের কাজ করতেন। বেশি বড় ছাপাখানা নয়, দুটো মেশিন আর বারো-চোদ্দজন কর্মচারী। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানে থাকতে হতো বাবাকে। কাজের চাপ বেশি থাকলে রাতও হতো। আমাদের বাড়ি থেকে দুই গলি দূর হলেও দুপুরে খাবার জন্যে পর্যন্ত তাঁর বাড়ি ফেরা হতো না। দিদা সকালের রুটি আর ভাজি টিফিন বাক্সে ভরে দিতেন।

রাতে খেয়ে-দেয়ে শোবার আগে বাবা যখন পান চিবুতে চিবুতে দিদার সঙ্গে কথা বলছিলেন, তখন ক্যাম্পিং-এ যাওয়ার কথাটা পাড়লাম। একটু গম্ভীর হয়ে বাবা বললেন, 'আজ মাসের ক'তারিখ খেয়াল আছে?

ভয়ে ভয়ে বললাম, 'একুশ।'

'মাসের শেষে হঠাৎ ক্যাম্প করার বুদ্ধি গজালো কার মাথায়?'

'হঠাৎ করে ঠিক হয়েছে। আজই ব্রাদার ফিলিপ্স বললেন....।'

'তোমাদের ব্রাদাররা তো সুখেই আছেন। মাসের শেষে উটকো খরচের টাকা কোত্থেকে আসে শুনি?'

বাবার কথা শুনে সারাদিনের উত্তেজনা আর রোমাঞ্চ ফুটো বেলুনের মতো চুপসে গেলো। মাসের শেষে আমাদের সংসারে এটা যে বাড়তি বোঝা হতে পারে—কথাটা একবারও ভাবিনি।

পরশু আমাদের সবাই নতুন ধরনের ক্যাম্পিং-এ যাবে এক অজানা জায়গায়, আর

আমি ঘরে বসে ভাইয়ার টিটকিরি শুনবো, কথাটা ভাবতেই বুকের ভেতর কী যেন দলা পাকিয়ে গলা ঠেলে উঠে আসতে চাইলো। এর মানে দাঁড়াচ্ছে এ বছরে স্কুলের কোনো ফাংশনেও আমি স্টেজে উঠবো না। নিকোলাস স্যার নাটক আর কোরাস দুটোতেই আমাকে রেখেছিলেন। নাটকের পার্টটা কম বড় নয়, সাড়ে চার পৃষ্ঠা ডায়ালগ মুখস্ত করতে হয়েছে। নিখিল স্যারের নাটকের ছেলেরা যখন দেখবে জাঁক করে ক্যাম্পিং-এ যাবো বলে যাইনি, তখন কী পরিমাণ হাসাহাসি করবে দিব্য দৃষ্টিতে দেখতে পেলাম। কান্নায় গলা বুঁজে আসতে চাইছিলো, চৌকাঠ ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বাবা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'দশ টাকা মানে বোঝ তো, আমাদের পাঁচ দিনের বাজার খরচ। আমার বেতন পেতে তিন-চার তারিখ হবে। যাও, মন খারাপ করো না। বন্ধুদের কাছে শুনে নিও ক্যাম্পে এবার নতুন কী শিখিয়েছে।'

আমি তবু দাঁড়িয়ে থাকলাম। বাবাকে তো বোঝানো যাবে না এবারের ক্যাম্পিং একেবারে অন্য ধরনের। নিকোলাস স্যার আর জোসেফের কথা শুনে মনে হয়েছে এটা একটা মস্তো চ্যালেঞ্জের মতো।

দিদা আমার মনের অবস্থাটা বুঝতে পারলেন। বাবাকে বললেন, 'আমি একটা কাজ করতে পারি। কাল বরং পুরোনো খবরের কাগজ আর খালি শিশি বোতল কিছু বিক্রি করে দিই। কি বলিস সালু?'

দিদার কথা শুনে আমার বুকের ভেতরটা উত্তেজনায় টিব টিব করতে লাগলো।

'পুরোনো কাগজ বেচে ক পয়সাই বা পাবে!' বাবার গলাটা বিষণ্ন মনে হলো। আমি আবার চুপসে গেলাম।

দিদা উৎসাহভরা গলায় বললেন, 'গত দু'মাস কাগজ বেচিনি। আর ওষুধের শিশি বোতলও কিছু জমেছে। আট দশ টাকা হয়ে যাবে। কিছু কম পড়লে এই ছোঁড়ার ব্যাংক ভাঙবো'।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, 'আমার ব্যাংক দু'টাকার বেশি জমেছে।'

'তবে আর যেতে বাধা কোথায়?' শুকনো গলায় কথাগুলো বলে খবরের কাগজে মুখ ঢাকলেন বাবা।

ঘরে এসে দেখি বাবার ভয়ে ভাইয়া বসে অংক করছে। ক্লাসে আমি সব সময় প্রথম তিনজনের ভেতর থাকি বলে পরীক্ষার পর আমাকে পড়তে হয় না। ভাইয়া থাকে শেষ দশজনের ভেতরে। প্রায়ই অংকে ফেল করে। বাবা ওকে বলে দিয়েছেন ছুটির দেড় মাসের ভেতরে পাটিগণিত, এ্যালজেব্রা আর জ্যামিতির সবগুলো অনুশীলনী শেষ করে তাঁকে দেখাতে।

আমি আর ভাইয়া পার্টিশন দেয়া ঘরের এক পাশে থাকি। আরেক পাশে বসার জায়গা। বাবা আর দিদা এক ঘরে থাকেন। খাবার জন্য আমাদের কোন আলাদা ঘর নেই। সবাই রান্নাঘরে মাদুর পেতে খাই। পুরনো দিনের একতলা বাড়ি। আগে নাকি চৌধুরী বাড়ির সহিস আর মালিরা থাকতো এখানে। সামনে এক চিলতে রোয়াকের মতো। এরই ভাড়া মাসে ষাট টাকা।

ঘরের দরজা বন্ধ করে আমি আমার টিনের সুটকেসটা খুলে স্কাউটিং-এর ইউনিফর্ম,

হ্যাভারস্যাক, রোফ, নাইফ, ক্যান্টিন সব বের করলাম। দেখলাম মোজা জোড়া ধুতে হবে। জুতো রং করতে হবে। আর সব ঠিক আছে।

ভাইয়া এতক্ষণ আড় চোখে দেখছিলো। আমি ওর দিকে না তাকিয়ে সব কিছু গুছিয়ে রেখে আমার বিছানায় উঠে শুয়ে পড়লাম। ভাইয়া চাপা গলায় বললো, 'নিকোলাস স্যার বুঝি ভেবেছেন, তোদের বাদ দিয়ে আমরা ফাংশন করতে পারবো না?'

'কেন পারবে না।' লেপের বাইরে মুখটা বের করে বললাম, 'তুমি একাই তো একশ' ; তার ওপর খনুদা আছে পটলবাবু আছে, কম কী!' কথা না বাড়িয়ে আমি লেপ টেনে মুখ ঢেকে শুয়ে পড়লাম।

ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম কেনিয়াতে ওয়ার্ল্ড জাম্বুরি হচ্ছে। আমরা সবাই গিয়েছি সেখানে। ঘন জঙ্গলের ভেতর তাঁবু টানিয়েছি। রাতে বাইরে সিংহের ডাক শোনা যাচ্ছে। সবাই আগুন জ্বেলে গোল হয়ে বসে ক্যাম্প ফায়ার করছি। নইম গিটারে 'গ্লোরি গ্লোরি হালালুজা'র সুর বাজাচ্ছে। আমরা সবাই ওর বাজানোর সঙ্গে সঙ্গে গাইলাম—'এ্যাজ উই গো মার্চিং অল।' হঠাৎ নিকোলাস স্যার কোত্থেকে এসে বললেন, 'আমাদের ট্রুপ এবার বেস্ট পারফরমেন্স এ্যাওয়ার্ড পাচ্ছে।' সবাই হুররে— বলে চীৎকার করে উঠলাম।

ঠিক তখনই ঘুম ভাঙলো দিদার ডাকে—'আর কতো ঘুমোবি? তোর বাবা প্রেসে চলে গেলো। উঠে নাশতা খেয়ে আমাকে একটা পুরোনো কাগজঅলা ডেকে দে।'

এক লাফে উঠে তিরিশটা বুকডন দিয়ে মুখ হাত ধুয়ে রান্নাঘরে খেতে বসেছি, এমন সময় বাইরে শুনি—'আছে-এ পুরানা শিশি বোতল কাগ-অ-জ।' মনে হলো জীবনে এত সুন্দর ডাক শুনিনি।

ছুটে গিয়ে কাগজওয়ালাকে ডেকে আনলাম। দিদা বসলেন দর ঠিক করতে। অনেক কাগজের লোভ দেখিয়ে দিদা দশ আনায় রফা করলেন। মেপে হিসেব করে দেখা গেলো মোটে চার টাকা ছ আনা হয়েছে।

আমি একটু দমে গিয়ে বললাম, 'দিদা শিশি বোতলগুলো আনবো?'

ইশারা পেয়েই স্টোর রুম খালি করে যত শিশি বোতল কৌটা ছিলো এনে দিদার সামনে রাখলাম। দিদা একটা একটা করে দর করতে লাগলেন। শিশি বোতল বিক্রি করে দুটাকা বারো আনা হলো। কাগজঅলা বললো 'পুরানা খাতা বই নাই?'

আমার ক্লাস এইটের বইগুলো পরীক্ষার পরই ভাইয়া নিয়ে বাংলা বাজারের পুরোনো বইয়ের দোকানে বিক্রি করে দিয়েছে। খাতা যে ক'টা ছিলো আনলাম। মলাটওয়ালা খাতা চার আনা করে সের। মাত্র দেড় সের হলো। দশ টাকা হতে আরো আড়াই টাকা বাকি। দিদাকে বললাম, 'ব্যাংক ভেঙে দেখবো?'

'তুই থামতো।' আমাকে ধমকে দিদা কাগজঅলাকে বললেন, 'আর কী নাও তোমরা?'

'পুরান কাপুড় লই। এ্যালমুনিয়ামের ভাঙা হাড়ি পাতিল লই। তামা পিতলের জিনিস লই। আছেনি গো দাদিজান?'

দিদা বাবার পোকায় খাওয়া একটা কোট, আমার ছোট হয়ে যাওয়া দুটো প্যান্ট

আর একটা শার্ট আনলেন। তাতেও যখন হলো না, এ্যালমুনিয়ামের ফুটো ঘটি আর একটা ছোট পাতিল দিলেন। সব হিসেব করে দশ টাকা পাঁচ আনা নিয়ে কাগজঅলাকে বিদায় করলেন। বললেন, 'এই দশ টাকা তোর। সাবধানে রাখ : পাঁচ আনা দিয়ে বাজার থেকে একটা নারকেল আর একপো গুড় এনে দে। কাল সকালে চিতই পিঠা বানাবো। তোর বাবা খুব পছন্দ করে।'

সুত্রাপুরের বাজার থেকে দিদাকে নারকেল গুড় এনে দিয়ে ছুটলাম স্কুলে। পথে দেখি হাজারীর কেবিনে খনুদা আর লতু বসে আছে। ভাইয়া সকালে গিটার শিখতে গেছে ডালপট্টির সুরঙ্গনা একাডেমিতে। বাবা বলেছেন যত ভাল বাজাতে শিখুক না কেন পরীক্ষার রেজাল্ট দশের ভেতরে না থাকলে গিটার কিনে দেবেন না। অগত্যা ওর এক বন্ধুর গিটার দিয়ে শিখছে। ও নিজেও জানে এ জন্যে দশের ভেতরে থাকতে পারবে না।

স্কুলে গিয়ে দেখি নিকোলাস স্যার দলবল নিয়ে ডেন খুলে জিনিসপত্র সব বের করছেন। জিনিস বলতে, তাঁবু, হাড়ি পাতিল, বালতি, দড়ি, বাঁশ এই সব। আমিও হাত লাগালাম। প্যান্থার পেট্রলের এ্যাসিসটেন্ট শিবলী চাপা গলায় বললো, 'নিখিল স্যার রেগে বাঁখারি হয়ে আছেন!'

তাঁবু ভাঁজ করতে করতে বললাম, 'কেন, আবার কী হলো?'

'আমরা সবাই ক্যাম্পে যাচ্ছি বলে।'

'আমরা কি ক্যাম্পেও যেতে পারবো না?'

'চুপ! আসছেন!'

শিবলীর কথা শুনে আড় চোখে তাকিয়ে দেখি গোল মুখটা আরো গোল করে নিখিল স্যার হন্তদন্ত হয়ে এ দিকে আসছেন। কোনো দিকে না তাকিয়ে সোজা এসে বললেন, 'আপনি এসব কী করছেন নিকোলাস স্যার?'

'কী করছি দেখতেই তো পাচ্ছেন! ক্যাম্পিং-এ যাচ্ছি।' নিকোলাস স্যার গম্ভীর হয়ে বললেন।

'তা তো দেখতেই পাচ্ছি।' মিহি গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন নিখিল স্যার—'আমাকে এভাবে জব্দ না করলে বুঝি চলছিলো না?'

'আপনাকে কেন জব্দ করবো?'

'কেন করবেন আপনি সেটা ভালো জানেন।'

'আমি আপানার কথা বুঝতে পারছি না নিখিল স্যার।'

'খুব পারছেন! আমাকে কচি খোকা ভাববেন না নিকোলাস স্যার। আপনি ক্যাম্পে যাবার কথা বলে আমার নাটকের দল ভেঙে দিয়েছেন। জো-কে ছাড়া আমি লাইট করবো কাকে দিয়ে? জগৎশেঠ, ক্লাইভ, ওয়াট আর লুৎফার পার্ট করবে কে শুনি? সব কটাকে তো আপনি নিয়ে যাচ্ছেন!"

'আমি কেন আপনার জগৎশেঠ, লুৎফা নিতে যাবো?'

'আমি এখনো পাগল হইনি নিকোলাস স্যার। আপনি আরিফ, শওকত, নীলু, বান্টি সবাইকে নিয়ে যাচ্ছেন। কেন নিয়ে যাচ্ছেন—ভেবেছেন কিছুই বুঝি না?'

'আপনার কাছে ওদের কেউ হয়তো জগৎশেঠ, ওয়াট, ক্লাইভ, লুৎফা হতে পারে। তবে আমার কাছে ওরা ট্রপ লিডার, পেট্রল লিডার আর এসিসটেন্ট পেট্রল লিডার। ওদের বাদ দিয়ে ক্যাম্পিং-এ যাওয়া সম্ভব নয়। আপনি যদি ওদের কাছে জানতে চান কোনটা ওরা বেশি পছন্দ করবে—লুৎফা, জগৎশেঠ হয়ে আপনার স্টেজে ওঠা না পেট্রল আর ট্রপ লিডার হয়ে ক্যাম্পিং-এ যাওয়া—আমার মনে হয় ওর শেষেরটাই পছন্দ করবে।'

'তাতো বলবেনই। আপনাকে দেড় ঘন্টা সময় দেইনি বলে আমার এত বড় সর্বনাশ করবেন আপনি?'

নিখিল স্যারের চেঁচানো শুনে দোতালা থেকে নেমে এলেন ব্রাদার ফিলিক্স। বললেন, 'আইজ আবার কী হইসে নিখিল স্যার?'

'কী আর হবে! নিকোলাস স্যার আমার সর্বনাশ করবেন বলে পণ করেছেন। আমার নাটকের ছেলেদের তিনি ক্যাম্পে নিয়ে যাচ্ছেন। দু'মাস ধরে আমি মহড়া দিচ্ছি। দশদিন পর ফাংশন, এর ভেতরে আমি কোথায় পাবো জগৎশেঠ আর ক্লাইভ? কোথায় পাবো ওয়াট আর লুৎফাকে?'

ভুরু কুঁচকে অবাক হয়ে ব্রাদার জিজ্ঞেস করলেন, 'কোন ক্লাইভের কথা কইতাসেন?'

শান্ত গলায় নিকোলাস স্যার বললেন, 'ইতিহাসে ক্লাইভ একজনই আছেন। পলাশীর যুদ্ধে যিনি ইংরেজদের সেনাপতি ছিলেন।'

'লুৎফা কে?'

'নবাব সিরাজউদ্দৌলার বেগম।'

'এদের সঙ্গে আপনার কী সম্পর্ক?'

'ওরা আমাদের ট্রুপের স্কাউট। ট্রুপ লিডার আর পেট্রল লিডার।'

'আমি কিছু বুঝতাসি না।' অবাক হয়ে ব্রাদার বান্দুরার বাবুর্চি লিস্টারের কাছে শেখা বাংলায় প্রশ্ন করলেন—'আপনি এসব কি কইতাসেন নিকোলাস স্যার? নবাবের বেগম আর ইংরেজের সেনাপতি আপনাগো স্কাউট হয় ক্যামনে? হ্যারাত দুইশ বছর আগে স্বর্গে গেছেন।'

'সব সময় আপনার ঠাট্টা ইয়ার্কি ভাল লাগে না নিকোলাস স্যার।' গলা সপ্তমে তুলে নিখিল স্যার বললেন, 'আমি সিরাজউদ্দৌলা নাটক করছি। আপনার কটা ছেলে সেই নাটকে এ্যাকটিং করছে, আপনি তাদের ভাগিয়ে নিচ্ছেন—কথাগুলো পষ্ট করে ব্রাদার ফিলিক্সকে বললে কী হয়?'

'এই কথা আগে কইবেন তো!' বলে হা হা করে হাসলেন ব্রাদার ফিলিক্স। 'আমি তো ডর পাইসিলাম। দুশ বছরের পুরান নবাবের বেগম আর ইংরেজের সেনাপতি আমাগ স্কুলে স্কাউটিং করে—হা—হা—হা।'

নিখিল স্যার বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আমার নাটকের কী হবে শুনি?'

হাসি থামিয়ে ব্রাদার বললেন 'আপনার পছন্দ হইলে আমি ক্লাইভের পার্টে এ্যাকটিং করতাম পারি। ছোটবেলায় আমি ম্যালা নাটক করসি।'

'আপনার এই বাংলা ক্লাইভ বললে আমাকে সবাই পচা ডিম ছুঁড়বে।'

'হায়, হায়, তাইলে আমি কী করতাম পারি? আমি যে তাগোরে ক্যাম্পিং-এ যাইবার কইসি।'

নিকোলাস স্যার বললেন, 'আজ সকালে কমিশনারের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। তিনি শেষ দিন উপস্থিত থাকবেন। আরিফ পারমিশনের জন্য চলে গেছে। জো গেছে বাজার করতে। এই অবস্থায় কাম্পিং-এ যাওয়া বন্ধ করা সম্ভব নয়।'

ভাঙা গলায় নিখিল স্যার আবার বললেন, 'আমার নাটকের কী হবে?'

নিকোলাস স্যার বললেন, 'খনুকে বলুন লুৎফার পার্ট করতে। একবার তো করেছিলো।'

'সে তো পাঁচ বছর আগে। এখন যে ওর গোঁপ দাড়ি গজিয়েছে, ষাঁড়ের মতো গলা আর তালগাছের মতো ঢ্যাঙা হয়েছে—কিছুই বুঝি নজরে পড়েনি?'

ব্রাদার আপোসের গলায় বললেন, ওইন্য নাটক করেন না নিখিল স্যার। সিরাজউদ্দৌলাত দুইবার দেখাইসেন।'

'হ্যাঃ! দশ দিনে আমি নতুন নাটক করবো! বললেই হলো!' বলে দুমদাম পা ফেলে চলে গেলেন নিখিল স্যার।

ক্যাম্পিং-এ যাওয়ার কথায় কাল নিকোলাস স্যার কেন রহস্যময় হেসেছিলেন এতক্ষণে আমাদের কাছে পরিষ্কার হলো। আমরা সবাই হাসি চাপবার জন্য কাজে ডবল মনোযোগ দিলাম। ব্রাদার ফিলিপ্সও মুখ টিপে হেসে চলে গেলেন।

জিনিসপত্র গোছাতে গোছাতে যখন দুপুর একটা বাজে— ট্রুপ লিডার আরিফ শুকনো মুখে এসে নিকোলাস স্যারকে বললো, 'বাগানবাড়ির পারমিশন পাওয়া গেলো না। এক সিনেমা কোম্পানি নাকি সুটিং-এর জন্য ভাড়া নিয়েছে।'

অবাক হয়ে নিকোলাস স্যার বললেন, 'কমিশনারের সঙ্গে সকালে আমার কথা হয়েছে। তখন তো কিছু বলেননি?'

'তিনি নাকি আগে জানতেন না।' ম্লান মুখে ট্রুপ লিডার বললো, 'তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেছেন, ওখানে জানুয়ারির আগে ক্যাম্পিং-এ যাওয়া যাবে না।'

'জানুয়ারিতে তো আমাদের ক্লাস শুরু হয়ে যাবে?'

'বলেছি। তিনি বললেন, মৌচাক যেতে।'

'আমরা যে ধরনের ক্যাম্পিং-এর প্ল্যান করেছি সেটা যে মৌচাকে সম্ভব নয়, বলো নি?'

'বলেছি। তিনি বললেন, এর জন্য উচিত ছিলো পনেরো দিন আগে ওঁকে জানানো।'

নিকোলাস স্যার হতভম্ব হয়ে ঘাসের ওপর বসে পড়লেন। আমরা কান খাড়া করে ওঁদের কথা শুনলেও নিবিষ্ট মনে আমাদের কাজ করে যাচ্ছিলাম। কিছুক্ষণ চুপ থেকে নিকোলাস স্যার বললেন, 'কারা এই সিনেমা কোম্পানি—কিছু জানো আরিফ?'

'কোম্পানির নাম ফাইভ স্টার মুভিজ। যে ছবির স্যুটিং হচ্ছে ওটার নাম রাজনতর্কী।'

নিকোলাস স্যার কিছুক্ষণ চুপ থেকে কি যেন ভাবলেন। তারপর কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'ক্যাম্পিং-এ আমরা যাবোই আরিফ। স্পট আমি আজ বিকেলের মধ্যেই ঠিক করবো। তুমি ছেলেদের এখন বাড়ি যেতে বলে দাও। সবাই যেন বিকেল চারটায় উপস্থিত হয়। ওদের কম্বলগুলো ডেনে জমা দিতে বলো। নিজেরা এতোটা পথ বইতে পারবে না।'

নিকোলাস স্যারের কথা শুনে বোঝা গেলো যাওয়ার ব্যাপারে জিদ ষোল আনা থাকলেও উৎসাহে কোথায় যেন ভাটা পড়েছে। একবার আমরা আরমানিটোলার মাঠে একদিনের জন্য ক্যাম্প করেছিলাম। কে জানে শেষ পর্যন্ত হয়তো তাই হবে। আমরাও বেশ কিছুটা দমে গেলাম।

বাড়িতে গিয়ে দুপুরের খাওয়াটা নাকে মুখে গুঁজে স্কুলে আসতে যাবো— বাইরে রোয়াকে দেখি ভাইয়া বসে আছে। একগাল হেসে বললো, 'কিরে তোদের নাকি ক্যাম্পিং-এ যাওয়া হচ্ছে না?'

'তোমাকে কে বললো?'

'সদানন্দর কাছে শুনলাম। সত্যি নাকি!' আহ্লাদে গদ গদ হয়ে ওর গলা বুজে এলো।

'ক্যাম্পে আমরা যাবোই। পারলে লুৎফা আর ক্লাইভের পার্টি মুখস্থ করো গে, নইলে নিজের চরকায় তেল দাও।' এই বলে আমি হন্ হন্ করে চলে এলাম।

স্কুলে এসে দেখি মোটে তিনটে বাজে। এর ভেতরে অর্ধেকের বেশি ছেলে চলে এসেছে। আমাকে দেখে শিবলী আর বান্টি এগিয়ে এলো—'খবর কিছু পেলি?'

'কিসের খবর?'

'পারমিশন পাওয়া গেলো কি-না?'

'আমি কী করে জানবো? স্যার কিম্বা আরিফ ভাই আসুক।'

বান্টি বেশ আস্থার গলায় বললো, 'আমার মন বলছে নিকোলাস স্যার ঠিকই একটা ব্যবস্থা করবেন।'

শিবলী গলা নামিয়ে বললো, 'নিখিল স্যার আবার কমিশনারকে কিছু বলেননি তো?'

আমাদের এইসব জল্পনার ভেতরে চারটে বেজে গেলো। সবার শেষে এলো পেট্রল লিডার জোসেফ ডি কস্টা। তখনও নিকোলাস স্যার বা ট্রুপ লিডার কেউ আসেননি। জোসেফ পেট্রল লিডার আর এ্যাসিসটেন্টদের ডেকে বললো, 'তোমরা তো জানো আমরা এবার নতুন ধরনের ক্যাম্পিং-এ যাচ্ছি। যে কারণে এ মুহূর্তে বলা যাচ্ছে না আমরা কোথায় যাবো।'

'একটু হিন্টস দে না জো'। জোসেফের ক্লাসমেট শওকত তেলমাখা গলায় অনুনয় করলো।

'না কোন হিন্টস নয়। কাল সকালে বাবুর্চি লিস্টারের কাছে আমাদের নির্দেশ পাবে।' জোসেফ গম্ভীর হয়ে বললো, 'সবাই ভোর সাতটায় এখানে আসবে। লিস্টার এনামুলকে একটা চিরকুট দেবে।'

কঠিন পরীক্ষা শরু

খুব কম কথার মানুষ জোসেফ। সব সময় কড়া ডিসিপ্লিন মেনে চলে। ওর প্রাণের বন্ধু প্যান্থার পেট্রলের শওকত এত পটালো কোথায় যাওয়া হবে জানবার জন্য—জো মুখ থেকে টু শব্দটি বের করলো না। শওকত বারবার বলছিলো, 'একটু হিন্টস দে দোস্ত, এত সাসপেন্স-এ রাখিস না, টেনশনের চোটে পেট ফেটে যাবে।'

জো গম্ভীর গলায় বললো, 'তোর লজ্জা করা উচিত শওকত। পেট্রল লিডার হয়ে আমাকে তুই ডিসিপ্লিন ভাঙতে বলছিস।'

'আহা, ডিসিপ্লিন ভাঙতে কখন বললাম! তুই সব সময় আমার কথার উল্টো মানে করিস। ডিসিপ্লিন কি কাচের ফুলদানি—একটু হিন্টস দিলে ভেঙে যাবে!' মুখ ভার করে বললো শওকত।

জো তখন ফর্দ মিলিয়ে শেষবারের মতো জিনিসপত্র দেখে নিচ্ছিলো। শওকতের কথার কোন উত্তরই দিলো না। প্যাট্রিক চেঁচিয়ে বললো, 'বারোটা এ্যাক্স?' জো বললো, 'বারোটা এ্যাক্স।' রঞ্জিত বললো, 'ষাটটা বাঁশ?' জো বললো, 'ষাটটা বাঁশ। চেক করে দেখো, ফাটা যেন না থাকে।' প্যাট্রিক বললো, 'চব্বিশটা হাঁড়ি আর চব্বিশটা ঢাকনি।' জো বললো, 'ঠিক আছে।'

ফর্দ মেলানো শেষ হলে শওকত আবার বললো, 'আচ্ছা দোস্ত, আরিফ ভাই তখন কোন্ বাগান বাড়ির কথা বলছিলো তুই জানিস?

'না।'

'ওখানে তো যাওয়া হচ্ছে না। বললে দোষ কী?'

'হচ্ছে না কে বললো? হতেও পারে।'

'আচ্ছা অন্য কিছু না বল, পূর্ব-পশ্চিম কোন দিকে সেটা তো বলতে পারিস।'

'কাল সকালেই জানতে পারবি।'

আমাদের উল্‌ফ পেট্রলের লিডার এনামুল আমার এক ক্লাস ওপরে পড়ে। খুবই নিরীহ ভালো মানুষ। শওকতকে বললো, 'তুই জোকে এত বিরক্ত করছিস কেন। তোর ছেলেদের দ্যাখ, কে কে যাচ্ছে, জিনিসপত্র সব ঠিক মতো নিচ্ছি কি-না।'

শওকত হাঁড়ির মতো মুখ করে বললো, 'তুমি তোমার ছেলেদের সামলাও। আমার ছেলেরা ঠিক আছে।'

ডেন থেকে জিনিসপত্তর বের করে গুছিয়ে বাড়ি ফিরতে ফিরতে রাত হয়ে গেলো। সামনের রোয়াকে বসে ভাইয়া আর খনুদা গুলতানি মারছিলো। দুচোখে দেখতে পারি না খনুদাটাকে। গুণ্ডোদের মতো মাসল ফুলিয়ে বেড়ায়, পড়াশোনায় লবডঙ্কা। দিদা বলেন, ভাইয়া নাকি ওর সঙ্গে মিশে উচ্ছন্নে গেছে। আমাকে দেখে খনুদা হেঁড়ে গলায় বললো, 'এতোক্ষণে বুঝি ফেরা হলো নিকোলাস স্যারের বাছুরের। তাও ভালো খোয়াড়ে যেতে হয় নি।'

আমি যখন কাব ছিলাম তখন থেকে নিখিল স্যারের পেয়ারের এই পেয়াদাটি আমাকে নিকোলাস স্যারের বাছুর বলে ডাকে। কাব মানে যে বাচ্চা বাঘ, সিংহ, নেকড়ে এ কথাটা বহুবার বলার পরও ওর মাথায় ঢোকেনি। ঢুকলে কি আর ক্লাস নাইনে দুবার ফেল করে!

ভাইয়া ওর কথায় হি হি করে হেসে বললো, 'যা বলেছিস খনু, ফাংশনে চান্স না পেয়ে বেচারারা মনের দুঃখে বনবাসী হবে বলে ঠিক করেছে।'

খনুদা বললো, 'নিখিল স্যার সব ক'টার নামের পাশে লাল কালির দাগ দিয়েছে। এ জন্মে আর স্টেজে উঠতে হবে না। তোদের মতো গরু বাছুর ছাড়াই আমরা ফাংশন করবো দেখিস।'

বললাম, 'তুমি তো পারো শুধু স্টেজে উঠে মাসল দেখাতে আর ভাইয়া তিন বছর ধরে গিটারে কেবল খরবায়ু বয় বেগে বাজিয়ে যাচ্ছে। তাই দিয়ে না হয় তিন ঘন্টার ফাংশন কোরো। আমরা তো বাগড়া দিচ্ছি না।'

'ভারি তো এলেন এক লটবর!' ভাইয়া ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, 'খনু ম্যাজিক শিখেছে। এবার ও ম্যাজিক দেখাবে।'

'সেই সাথে এথেন্স সফরের অভিজ্ঞতাও শুনিয়ে দিও। ধরে নাও ম্যাজিক কার্পেটে এথেন্স ঘুরে এসেছো। জো যখন নেই..... ।'

'ম্যালা ফ্যাঁচ ফ্যাঁচ করিস না ছোঁড়া।' খনুদা গাঁক গাঁক করে বললো, 'দু'দিন মাথায় গাট্টা মারিনি বলে তেজ বেড়েছে।'

'কে কাকে মারছে শুনি!' ঘর থেকে বেরুলেন দিদা। আমাকে দেখে বললেন, 'কোন চুলোয় যাবে সাতে সকালে উঠে তার ঠিক নেই। দয়া করে চারটি খেয়ে আমাকে উদ্ধার করো।' তারপর ভাইয়াকে নিয়ে পড়লেন, 'সেই দুপুর থেকে এত কী কথা তোদের শুনি। এক কেলাশে কি করে দু'বছর থাকতে হয় তাই বুঝি জ্ঞান দিচ্ছে ফেলু মাস্টার খনু!'

যতো মাসলওয়ালা হোক না কেন খনুদা, দিদাকে পাড়ার সবাই ভয় পায়। 'না মানে—' ঘাড় চুলকে কি যেন বলতে যাচ্ছিলো, দিদা ওকে থামিয়ে দিলেন—'থাক, বানিয়ে বানিয়ে মিছে কথা বলতে হবে না। বাড়ি গিয়ে পুরনো পড়াগুলো নিয়ে বসো গে।'

যেভাবে এসেছিলেন সেভাবেই ভেতরে গেলেন দিদা। আমিও পেছন পেছন ঘরে ঢুকলাম। মা যে সেই কবে হাসপাতালে গিয়ে মরে গেছেন মনেও নেই। দিদা কোনোদিন টেরও পেতে দেননি সেই অভাবটুকু।

খেতে বসে দেখি দিদা আমার পাতে এক খানার বদলে দু'খানা মাছ তুলে দিলেন। বললেন, 'গতবার বাইরে গিয়ে তো আধখানা হয়ে এসেছিলে। এবারও কি নিজেদের রেঁধে খেতে হবে নাকি!'

'সেটাই তো নিয়ম। তুমি তো জানো না দিদা, গতবার ক্যাম্প থেকে ফেরার পর রান্নায় ভালো করার জন্য আমাকে ব্যাজ দেয়া হয়েছে।'

'তবে আর কি! খিদে পেলে ওই ব্যাজ পানিতে গুলে খেয়ে নিও। তা এবার ক'দিন থাকা হবে শুনি?'

'পাঁচ দিনের কম নয়। সাত দিনও হতে পারে।' খেতে খেতে বললাম, 'তুমি যে কাগজ বেচে আমাকে এতগুলো টাকা দিলে বাবা রাগ করেনি তো!'

'রাগের কী আছে!' দিদা কাষ্ঠ হাসলেন। 'বুঝিস তো, অভাবের সংসার, হিসাবের বাইরে এক পা ফেলা যায় না।' একটু থেমে দিদা বললেন, 'তবে এটা জেনে রেখো, এবার পরীক্ষায় ফার্স্ট হয়েছো বলেই আমি ওভাবে সুপারিশ করছি। নইলে কী হতো আমি জানি না।'

'সেকেন্ড হলে নিশ্চয়ই পিঠে খড়ম ভাঙতে না! মোটে তো তিন নম্বরের জন্য ফার্স্ট।'

'নাও, ওঠো এবার, কাপড় চোপড় গুছিয়ে নাও গে।'

'ভোরে আমি কিন্তু সাতটায় বেরুবো দিদা।'

মৃদু হেসে দিদা বললেন, 'সে জন্যেই সকালের নাশতা এখন বানিয়ে রাখছি। দেখিস সারা রাত রসে ভিজে পিঠেগুলো মোমের মতো নরোম হয়ে থাকবে।'

একটুও বাড়িয়ে বলেননি দিদা। ভোর ঠিক সাড়ে ছটায় খেতে দিলেন। ভাইয়া তখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। স্কুল বন্ধ বলে আজকাল বাবা এ নিয়ে অন্য সময়ের মতো বকাবকি করেন না। আমাদের দুজনকে একসঙ্গে খেতে দিয়েছেন দিদা। বাবা খেতে খেতে বললেন, এখনো তুমি আগের মতো বানাতে পারো মা। আমি তো ভেবেছিলাম, কতদিন বানাওনি, বুঝি ভুলে গেছো!'

দিদা মাটির হাঁড়ি থেকে রসে ভেজা আরেকটা পিঠা বাবার পাতে তুলে দিয়ে বললেন, 'এসব কি ভোলা যায় কখনো! পেট ভরে খা।'

'আমাকে আর দিও না। পেট ভরে গিয়েছে। রান্টু এটা খা।' বলে পাতের পিঠাখানা বাবা আমাকে তুলে দিলেন।

বাবা কোনদিন এভাবে আমাদের পাতে কিছু তুলে দিয়েছেন বলে মনে পড়ে না। বুঝলাম আমাদের বদমেজাজী বাবার মনেও একটু নরোম জায়গা আছে। সব বাবারই থাকে। শুধু জানা ছিলো না আমাদের বাবার আছে। বাবার আদর পেয়ে কান্নার মতো কী যেন গলার কাছে দলা পাকালো। আমার আগেই বাবা উঠে গেলেন। যাবার সময় বললেন, 'সাবধানে থাকিস। একা পুকুরে নামবি না। ঠাণ্ডা লাগাবি না। আমার বাঁদর টুপিটা নিয়ে যাস। মা, হাত খরচের জন্য ওকে একটা টাকা দিও।'

ঘরে গিয়ে ইউনিফর্ম পরে হ্যাভারস্যাকটা পিঠে নিয়ে যেই বেরোতে যাবো—ভাইয়া লেপের ভেতর থেকে মুখ বের করে—'যাচ্ছিস বুঝি, যা যা, পথ হারিয়ে আবার বাড়িতে

ফেরত আসিস না।' বলে উদ্দেশ্যপূর্ণ হেসে লেপের তলায় মুখ লুকোলো।

ওর কথায় কান না দিয়ে শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে সাতটায় স্কুলে এসে পৌঁছলাম। দেখি বেশির ভাগ ছেলেই এসে গেছে। তবে কয়েকজন বাদও পড়েছে। কারো শরীর খারাপ, কেউ গ্রামের বাড়িতে, কেউ টাকা যোগাড় করতে পারেনি বলে অন্য অজুহাত দিয়েছে। দিদা যদি কাল খবরের কাগজ আর বাকি সব জিনিস বেচে টাকা না দিতেন আমিই কি যেতে পারতাম! ঠিকই মুখ কালো করে পেট্রল লিডার এনামুলকে বলতে হতো, পেট খারাপ যেতে পারবো না। যেমন কি-না আমাদের পেট্রলের সদানন্দ কাল বলে গেছে। সদানন্দ কখনো ক্যাম্পিং বা পিকিনিকে যায় না। ওর বাবা সুবল ডাক্তারের ডিস্পেন্সারিতে কম্পাউণ্ডারের কাজ করেন।

নিকোলাস স্যার ডেনের জিনিসপত্র নিয়ে এবার আগেই চলে গেছেন। সঙ্গে আরিফ আর জোসেফ।

গোটা দলের নেতৃত্ব দেবে পেট্রল লিডারদের ভেতর সবচেয়ে সিনিয়র আমাদের উলফ পেট্রলের এনামুল। প্যান্থার পেট্রলের শওকত হচ্ছে টু. আই. সি অর্থাৎ সেকেণ্ড ইন কমাণ্ড। সব কিছুতেই শওকত অতি উৎসাহী। সাড়ে সাতটা বাজার আগেই এনামুলকে বললো, 'আমরা অপেক্ষা করছি কেন? লিস্টারের কাছ থেকে কাগজটা নিয়ে দেখি না কী আছে?'

এনামুল ঘড়ি দেখে বললো, 'সোয়া সাতটা বাজে। আরো পনেরো মিনিট অপেক্ষা করবো। ছেলেরা সবাই এখনো আসেনি।'

'কাগজ নিয়ে তোমাকে আর আমাকেই ভাবতে হবে। পনেরো মিনিট এগিয়ে থাকলে ক্ষতি কী। যাই, লিস্টারের কাছ থেকে ওটা নিয়ে আসি।' এই বলে অধৈর্য শওকত বাবুর্চিদের কোয়ার্টারের দিকে গেলো।

এনামুল ওর দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসলো। শওকতের পেট্রলের এ্যাসিস্টেন্ট লিডার শিবলী ছিলো পাশে দাঁড়িয়ে। বললো, 'হাসছো কেন এনামুল ভাই?'

'লিস্টারকে ঘরে পেলে তো!' এনামুলের মুখের রহস্যের হাসি।

একটু পরেই শওকত এলো গজরাতে গজরাতে—'কাণ্ড দেখেছো লিস্টারের? কোনো পাত্তা নেই। ঘর তালা বন্ধ। ধনাই, পরেশ কেউ জানে না কোথায় গেছে।'

মৃদু হেসে এনামুল বললো, 'এতো অধৈর্য হচ্ছো কেন? সাড়ে সাতটা এখনো বাজেনি! সবাইকে পেট্রল ওয়াইজ লাইনে দাঁড় করাও।'

অন্য সময় হলে শওকত এ নিয়ে নির্ঘাত কিছুক্ষণ তর্ক করতো। যাবার সময় ঘনিয়ে এসেছে, তাছাড়া ক্যাম্পে না পৌঁছানো পর্যন্ত এনামুল পুরো ট্রুপের লিডার, তাই আর কথা বাড়ালো না।

এনামুল লাইনে নেই বলে আমি লিডারের জায়গায় দাঁড়ালাম। আমাদের উলফ পেট্রলের সদানন্দ আর পনির যাচ্ছে না। এনামুলকে নিয়ে যাচ্ছি আমরা ছ'জন। শাহেদ, মুন্না, ফারুখ আমার সঙ্গে পড়ে। শেখর পড়ে এক ক্লাস নিচে, আমাকে রান্টুদা বলতে অজ্ঞান। মস্ত বড় লোকের ছেলে—এতটুকু অহংকার নেই। ভালো গানও গায়। অথচ শাহেদের বাবা পুলিশের কী যেন—দেমাগের জন্য ওর সঙ্গে কথা বলা দায়। সব ওর

বাবা আর মামাদের গল্প। মামাদের নাকি জাহাজের ব্যবসা আছে। মুন্না আর ফারুকের বাড়ির অবস্থা আমাদের মতো, তবে দুজনে মিলে জিমনাসিয়ামে গিয়ে ব্যায়াম শেখে, স্কুল টিমে ফুটবল খেলে।

লাইন করার পর কাউন্টিং-এ দেখা গেলো শেষ নম্বর এইট্টি সেভেন। মানে এনামুল আর শওকতকে নিয়ে আমরা উননব্বই জন যাচ্ছি এবারের ক্যাম্পিং-এ। এরকমই হয়। কোনবার কোনবার একশর ওপর যাওয়া হয় নি।

গোনার সময় বার বার হাতের ঘড়ি দেখছিলো শওকত। গোনা শেষ হতেই সাড়ে সাতটা বাজলো। দেখা গেলো বাবুর্চি লিস্টার আমাদের দিকে আসছে। শওকত আমাদের 'এ্যাট ইজ'—বলে ছুটলো লিস্টারের দিকে।

লিস্টার বুক পকেট থেকে একটা মুখবন্ধ সাদা খাম শওকতকে দিলো। শওকত অভিযোগের গলায় বলালো, 'তুমি কোথায় গিয়েছিলে লিস্টার? কখন থেকে খুঁজছি তোমাকে?'

লিস্টার মুখ টিপে হেসে বললো, 'পাইবা ক্যামনে। আমি তো নিকোলাস স্যারের কথা মতো নাই হইয়া আছিলাম। সাড়ে সাতটা বাজনের আগে তো আমারে পাওনের কথা আছিল না।'

সাদা খামটা এনামুলের হাতে দিয়ে শওকত জুলজুল করে ওটার দিকে তাকিয়ে রইলো, পারলে যেন গিলে খাবে।

মৃদু হেসে এনামুল খামটা খুললো। ভেতর থেকে ভাঁজ করা এক টুকরো কাগজ বের করলো। আস্তে আস্তে ওর মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। গম্ভীর হয়ে কাগজটা বাড়িয়ে দিলো শওকতের দিকে।

অবাক হয়ে শওকত কাগজটা হাতে নিলো। ওটা দেখার পর ওর মুখটা লম্বা হয়ে গেলো। এনামুলের দিকে প্রশ্নভরা চোখে তাকালো। এনামুল গম্ভীর হয়ে বললো, 'পেট্রল লিডারদের দেখতে দাও ওটা।'

দশজন পেট্রল লিডারের হাত ঘুরে কাগজটা আমার কাছে এলো। ততক্ষণে কারো চোখ ছানাবড়া, কারো মুখ এনামুলের মতো গম্ভীর, কারো চোয়াল ঝুলে পড়েছে।

কাগজের ওপর চোখ বুলিয়ে আমারও খাবি খাওয়ার দশা হলো। কতোগুলো ইংরেজি সংখ্যা আর অক্ষরের ভেতর শুধু একটা শব্দ পড়তে পারলাম। কাগজটায় লেখা ছিলো—

Start 21 9 12 14 T 19 22 S 12 6 T 19 20 AT 22
A 13 21 12 15 15 124 T 1922 tra 24 16 S

স্টার্ট তো বুঝলাম, বাকি সব কি! কাগজ উল্টে দেখলাম কোথাও কোন সংকেত পর্যন্ত নেই। আমার হাত থেকে শিবলী নিলো কাগজটা। ওর বিস্ময়ভরা মুখটা কয়েক সেকেণ্ডের ভেতর বোকা বোকা হয়ে গেলো। তারপর ওটা বাড়িয়ে দিলো প্যাট্রিকের দিকে।

একে একে সবার হাত ঘুরলো কাগজটা। শুধু মুখ চাওয়া-চাওয়ি আর গুনগুন করতে করতে সাতটটা চল্লিশ হলো। সবার দেখার পর ওটা আবার এনামুলের হাতে

গেলো। এনামুল গম্ভীর হয়ে বললো, 'এতে কী লেখা আছে আমরা যদি বের করতে না পারি—ক্যাম্পিং-এ যাওয়া হবে না।'

শওকত আপন মনে বললো, 'কোনো সূত্রটুত্র দেবে তো!'

আমি বললাম, 'এনামুল ভাই এভাবে সময় নষ্ট না করে আমরা বরং ড্রইং ক্লাসে গিয়ে বসি। আমাদের ব্ল্যাকবোর্ড আর একটা চক দরকার হবে।'

'ঠিক বলছো রান্টু।' প্রশংসা ভরা গলায় এনামুল কথাটা বলে সবাইকে ড্রইং ক্লাসে যেতে বললো।

ড্রইং ক্লাস হচ্ছে স্কুলের ক্লাসরুমগুলোর ভেতর সবচেয়ে বড়। শ খানেক ছাত্র অনায়াসে বসতে পারে সেখানে। শওকত গিয়ে ধনাইর কাছ থেকে চক আর ডাস্টার নিয়ে এলো।

চিরকুটে লেখাটা যেভাবে ছিলো এনামুল ঠিক সেভাবে ব্ল্যাক-বোর্ডের ওপর লিখলো। শওকতকে বললো, 'শব্দ করে পড়ো তো, সাউণ্ড এফেক্টে কিছু বোঝা যায় কি-না দেখি।'

শওকত নামতা পড়ার মতো একঘেঁয়ে ভঙ্গিতে পড়তে শুরু করলো—'স্টার্ট টু ওয়ান নাইন ওয়ান টু ওয়ান ফোর টি ওয়ান নাইন টুটু এস্ ওয়ান টু সিক্স টি ওয়ান নাইন টু ও এটি টুটু এ ওয়ান থ্রি টু থ্রি টু ওয়ান ওয়ান টু ওয়ান ফাইভ ওয়ান টুফোর টি ওয়ান নাইন টু টু টি আর এ টু নাইন ওয়ান সিক্স এস।'

আমাদের ভেতর শিবলী কবিতা লেখে। শওকতের পড়ার সময় ও মাথা দোলাচ্ছিলো। থামার পর বললো, 'বেশ একটা রিদম পাওয়া যাচ্ছে।'

এনামুল ভুরু কুঁচকে বললো, 'রিদম কোথায় পেলে?'

'এই যে দেখো না মাত্রা গুণে। টু টু এস ওয়ান, টু সিক্স টি ওয়ান—কেমন চার মাত্রার ছন্দ পাচ্ছো না?'

শওকত হা করে শিবলীর কথা শুনছিলো। বললো, 'কবিতার ক্লাস পেয়েছিস নাকি! ছন্দ মাত্রা এসব দিয়ে কী করবো?'

এনামুল বললো, 'আমি ভেবেছিলাম ধ্বনি থেকে কিছু বেরোতে পারে। আমার কানে কিছুই স্ট্রাইক করেনি। শওকতের পড়াটা আমার কাছে ডডনং পড়ার মত মনে হয়েছে।'

'ডডনং পড়া কাকে বলে?' জানতে চাইলো শওকত।

'সেই গল্প জানো না বুঝি! ঠিক মতো পয্ দিয়ে না পড়লে যে গোলমাল হয় তাকে ডডনং পড়া বলে।'

'গল্পটা কী? সব কিছুতেই শওকতের কৌতূহল।

'এক দোকানের সাইনবোর্ডে সাইনবোর্ড লিখিয়ে কাগজে লেখা কথা পড়ার সময় শব্দগুলো ভেতর ঠিক মতো ফাঁক দিতে না পেরে পড়লো—হরে করকম বা জিওবা রুদেরদো কান ডডনং। পরে কথাগুলো এইভাবে সাইনবোর্ডে লিখলো।' এই বলে এনামুল সাইনবোর্ডের কথাগুলো বোর্ডে লিখেলো।

শওকত বললো, 'কথাটা কী হবে?'

এনামুল মৃদু হেসে বললো, 'কথা তো এখানেই সব রয়েছে। ঠিক মতো পয্ দিয়ে

পড়তে হবে। আমি পযের জায়গায় দাগ দিয়ে দিচ্ছি। এবার পড়ো।'

শওকত এবার গড়গড় করে পড়লো, 'হরেক রকম বাজি ও বারুদের দোকান। ছেষট্টি নং।'

ক্লাস সুদ্ধো সবাই হো হো করে হেসে উঠলো। শওকত সবার সঙ্গে গলা মেলালো।

এনামুল সাইনবোর্ডের লেখা বোর্ড থেকে মুছে বললো, আমাদের আসল কথায় এসো। শওকত, যেখানে ফাঁক আছে সেখানে পয্ দিয়ে পড়ো। টু ওয়ান একসঙ্গে আছে। ওটাকে টুয়েন্টি ওয়ান পড়ো।'

এনামুলের কথামতো শওকত আবার পড়লো। এনামুল শুনে এপাশ-ওপাশ মাথা নাড়লো। শিবলী বললো, 'এবার আর আগের মতো রিদম পাওয়া গেলো না।'

এনামুল বললো, 'আমরা রিদম খুঁজছি না শিবলী। তোমরা সবাই ভাবো—কী হতে পারে।'

আমি বললাম, 'তুমি যে পযের কথা বললে এনামুল ভাই, সেভাবে কিছুটা এগুনো যাবে।'

'থামলে কেন, বলো।'

'লক্ষ্য করে দেখো। কতগুলো সংখ্যা বা অক্ষরের ভেতর ফাঁক একটু বেশি। বেশি ফাঁকটাকে বড় পয্ ধারা যাক। তাহলে দাঁড়াচ্ছে এখানে স্টার্ট বাদ দিয়ে আটটা সাংকেতিক ইউনিট আছে। এই ইউনিটগুলো এক একটা বাক্য হতে পারে কিম্বা এক একটা শব্দ হতে পারে।'

'দারুণ বলেছো।' উচ্ছসিত হয়ে উঠলো এনামুল।

শওকত বললো, 'রান্টুর কথা যদি ঠিক হয় তাহলে দেখা যাচ্ছে একটা ইউনিট দু'বার আছে। একটা বাক্য দু'বার ব্যবহার করার যুক্তি নেই। কিন্তু একটা শব্দ দু'বার ব্যবহার করা যেতে পারে। আমি টি নাইন্টিন টুয়েন্টিটুর কথা বলছি।'

শাহেদ বললো, 'নাইনন্টি টুয়েন্টিটুতে ঘটেছে এমন কোন ঘটনার কথা বলা হতে পারে।'

এনামুল মাথা নাড়লো, 'ঘটনা হবে না। শওকত ঠিক ধরেছে। কোনও ওয়ার্ড হবে। রান্টু, প্যাট্রিক, তোমরা সবাই মাথা ঘামাও। আটটা কুড়ি বাজে।'

প্যাট্রিক বললো, 'শওকত আর রান্টুর কথা ধরে যদি এগুতে চাও তাহলে আরেক ধাপ এগুনো যেতে পারে। লক্ষ্য করে দেখো প্রথম শব্দ হচ্ছে স্টার্ট। এস টি এ আর—এই চারটে অক্ষর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে শব্দগুলোর ভেতর।'

মাথা নেড়ে সায় জানালো এনামুল। কিছুক্ষণ সারা ক্লাস একেবারে চুপ। গভীরভাবে ভাবছে সবাই। 'ইউরেকা, ইউরেকা 'বলে লাফিয়ে উঠলো শওকত। হঠাৎ উত্তেজিত গলায় বললো, 'বোর্ডে এ থেকে জেড পর্যন্ত লেখো তো এনামুল!'

এনামুলের লেখা শেষ হতেই শওকত বললো, 'এবার এর নিচে ওয়ান, বি'র নিচে টু, সি'র নিচে থ্রি-এভাবে ফিগারগুলো পর পর বসিয়ে দাও।'

এনামুল জেড-এর নিচে টুয়েন্টি সিক্স লিখে থামলো। শওকত আগের মতো উত্তেজিত গলায় বললো, 'এবার আমাদের সংকেতের ফিগারগুলোর জায়গায় এলফাবেট

বসিয়ে দাও নম্বর মতো।'

এনামুল বোর্ডে সংকেত উদ্ধার করতে গিয়ে লিখলো—

UILNTSV SLFTS

'না হচ্ছে না।' বাধা দিলো ডিয়ার পেট্রলের লিডার দিলীপ। বললো, 'এগুলো কোনো শব্দ হচ্ছে না। তাছাড়া শব্দের ভেতর এস থাকলে শওকতের থিওরি মতো সেটা ফিগারে লেখার তো কথা নয়, এখানে ফিগারেও এস্ আছে দেখা যাচ্ছে।'

চুপসে গিয়ে বসে পড়ল শওকত। হঠাৎ আমার মনে হলো শওকতের সূত্রটা উল্টো করে দেখলে কেমন হয়। উত্তেজনা চেপে বললাম, 'এনামুল ভাই, ওয়ান টু থ্রিগুলো এ বি সি-র নিচে না লিখে উল্টো দিকে জেড ওয়াই এক্স-এর নিচে লেখো তো।!'

এনামুল দ্রুত হাতে লেখা শেষ করতেই আমি বললাম, 'স্টার্ট এর পর লেখো এফ আর ও এম।'

ক্লাস সুদ্ধো সবাই একসঙ্গে চেঁচিয় উঠলো, 'ফ্রম! স্টার্ট ফ্রম। হুররে—।' মুখের হাসি কান পর্যন্ত ছড়িয়ে দিয়ে এনামুল লিখলো—

START FROM THE SOUTH GATE AND FOLLOW THE TRACKS.

আমার একপাশে শিবলী আরেক পাশে শেখর বসেছিলো। ফুটবলের মাঠে গোল দেয়ার পর বেচারা গোলদাতার যে দশা হয়, মুহূর্তের ভেতর আমার দশাও তাই হলো। ইউনিফর্মের ভাঁজ টাজ নষ্ট হয়ে একাকার কাণ্ড।

আমাদের চিৎকার শুনে ঘন্টা বুড়ো ভিনসেন্ট ছুটে এলো—'ওয়া কি! ওয়া কি!। পোলাডারে তো মাইরা ফালাইবা। দম আইটকা মরবো তো। ওয়া কোন দেশি আহ্লাদ!'

ভিনসেন্ট-এর কথায় ওরা আমাকে নামালো। শিবলী চেঁচিয়ে বললো, 'ঠিকানা পেয়ে গেছি ভিনসেন্ট দাদু।'

'তাইলে কাউ কাউ না কইরা বাইর ওইয়া পড়। কোনহানে যাইতে ওইবো হেইডা তো জান না।' বলে মিট মিট করে হাসতে লাগলো ভিনসেন্ট।

রেন্টু ছুটে এসে ওর গলা জড়িয়ে বললো, 'তুমি তো জানো ভিনসেন্ট দাদু। বলে দাও না কোথায় যেতে হবে!'

'জানি, কিন্তুক কমু না!' হাসি থামিয়ে এবার গম্ভীর হয়ে বললো ভিনসেন্ট, 'এইডা না তোমাগো পরীক্ষা! আমারে যে বড় উত্তর কইতে কও! ব্রাদার পিটার হুনলে তোমাগো কী কইবো জানো?'

এনামুল ব্যস্ত হয়ে বললো, 'না, না তোমাকে বলতে হবে না। রেন্টু তোমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে, বোঝো না কেন! ট্রুপ, গেট রেডি।'

'বুঝি! তয় কতা ওইলো পরীক্ষা নিয়া ঠাট্টা মশকরা করন ঠিক না।' এই বলে ভিনসেন্ট চলে গেলো।

আমাদের চ্যাঁচামেচিতে ওপর থেকে কখন যে ব্রদার ফিলিক্স নেমে এসেছেন টের পাইনি। সুইং ডোরের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে 'এত চিল্লাইতাস ক্যান, কি হইসে—' বলে বোর্ডের লেখা পড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে বুঝে নিলেন ঘটনাটা। মুখ টিপে হেসে

বললেন, 'এত ফুর্তি করনের কিসু নাই। সামনে ম্যালা শক্ত পরীক্ষা রইসে। সব পরীক্ষায় পাস করবা কি-না সন্দ আছে।'

ব্রাদার ফিলিপ্স-এর কথা শুনে সবাই হট্টগোল জুড়ে দিলো—'বললেই হলো পাস করবো না।' 'ক্যাম্পিং-এ বুঝি আগে কখনো যাইনি।' এসব শুনে ব্রাদার পালিয়ে বাঁচলেন। তখন পর্যন্ত আমরা কেই আঁচ করতে পারিনি, আমাদের সামনে বিপদের কত বড় খাঁড়া ঝুলছে।

বখাটেদের বাধা পেরিয়ে

সেদিন ছিলো রোববার। ছুটির দিন। বেশির ভাগ দোকানপাটই বন্ধ। রাস্তায় লোকজন আর গাড়ি-ঘোড়া চলাচলও অন্য দিনের চেয়ে অনেক কম। নইলে আমাদের মিছিলের বহর দেখে রাস্তায় ভিড় জমে যেতো। পাশাপাশি দুই সারিতে ঠিক মার্চ করে না হলেও বেশ ডিসিপ্লিন মতো হাঁটছিলাম। সবাই ইউনিফর্ম পরা, গলায় আমাদের ট্রুপের নীল-সাদা স্কার্ফ। পিঠে হ্যাভারস্যাক, হাতে বাঁশের লাঠি। সবার সামনে এনামুল আর শওকত। শওকতের হাতে আমাদের ট্রুপের ফ্ল্যাগ।

রাস্তায় লোকজন কম হলেও বাড়ির জানালা থেকে মেয়েরা কিংবা রোয়াকে বসে রোদ পোহানো বুড়োরা আমাদের দিকে প্রশংসা ভরা চোখে তাকাচ্ছিলো। ছেলেদের সবার মুখ শেষ ডিসেম্বরের সকাল আটটা নটার সূর্যের মতো ঝলমল করছিলো।

স্কুলের সাউথ গেট মানে পেছনের দরজা। সেই দরজা দিয়ে বেরিয়ে আমরা ডালপট্টির দিকে যাচ্ছিলাম। ট্র্যাক শুরু হয়েছে স্কুলের গেট থেকেই। নানা রকমের দিক সংকেত। কোথাও কয়েক টুকরো ইট দিয়ে—কোথাও কোন বাড়ির পাচিলের গায়ে চক দিয়ে নির্দেশ ছিলো 'এদিকে যাও' কিংবা 'এদিকে যেও না।' কোথাও ট্র্যাক ফলো করে চিঠিতে নির্দেশ পেলাম—'দশ গজ সামনে গিয়ে বাঁয়ে মোড় নাও।' না জানা থাকলে দেয়ালে আঁকা সংকেত বোঝার কারো সাধ্য নেই। আমাদের স্কুলের পিছনে আট দশটা গলি এমনভাবে জড়াজড়ি করে জট পাকিয়ে ছিলো যে, ট্র্যাক খুঁজে বের করার জন্য বার বার থামতে হচ্ছিলো।

ডালপট্টির মোড়ের কাছে এসে আমরা হঠাৎ ট্র্যাক হারিয়ে ফেললাম। খুঁজতে গিয়ে দেখি ফেলুমাস্টার খনুদা পাড়ার ক'টা বখাটে ছেলেকে নিয়ে হাজারীর কেবিনের সামনে আড্ডা মারছে। আমাদের দেখেই খনুদা ষাঁড়ের মতো গলায় বললো, 'ওই যে এলেন

নিকোলাস স্যারের এঁড়ে বাছুরের দল।'

ওদের মধ্যে একজন হেঁড়ে গলায় গান ধরলো, 'রাজার দুলালী সীতা বনবাসে যায় গো, বনবাসে যায়।'

খনুদা নাটুকে গলায় বললো, 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ।'

আরেকজন বেসুরো গলায় গাইলো, 'পথ হারাবো বলে এবার পথে নেমেছি-ই-ই।'

মুন্না ওদের দিকে এমনভাবে তাকালো যেন পারলে তখনই নুন লঙ্কা দিয়ে কাঁচা আমের মতো চিবিয়ে খায়। কিছুদূর গিয়ে দেখলাম একটা ইটের টুকরোর সংকেত 'এদিকে যাও।' অর্থাৎ যেদিক থেকে আমরা এসেছি সেই দিকের ইঙ্গিত। এই ট্র্যাকে কোনো গণ্ডগোল নেই। আবার ফিরে এলাম। রাগে দুঃখে আমাদের তখন মাথায় চুল ছেঁড়া বাকি।

'এভাবে এলোপাথাড়ি খুঁজলে চলবে না।' এই বলে এনামুল আমাদের তিন গ্রুপে ভাগ করে তিন দিকে পাঠালো। আমাদের গ্রুপে শওকত, শিবলী, শেখর, মুন্নাকে নিয়ে জনা বারো ছিলো।

পঞ্চাশ গজের মতো গিয়ে আমরা আরেকটা ট্র্যাক দেখলাম। এটাও ইট দিয়ে—এদিকে যাও।' তার মানে এখানেও কোন ভুল হয়নি। ভুলটা তাহলে হলো কোথায়। মুন্না আর শেখরকে বললাম, 'তোরা দু'জন দু'দিকের দেয়াল ভালো করে দেখ, কেউ কোন চিহ্ন মুছে ফেলেছে কি-না খেয়াল করিস।'

আমরা তন্ন তন্ন করে রাস্তার দুপাশে এমন এমনভাবে ট্র্যাক খুঁজতে লাগলাম যে রোয়াকে বসা এক বুড়ো বলেই ফেললেন, 'টাকা পয়সা হারিয়েছো বুঝি!' তাঁর সঙ্গী বললেন, 'কত টাকা ছিলো?'

শওকত বললো, 'ট্র্যাক হারিয়েছি।'

বুড়ো দু'জন অবাক হয়ে নিজেদের ভেতর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করলেন। আমরা কিছুটা পিছিয়ে এলাম। হঠাৎ দূর থেকে রিনরিনে গলায় চেঁচিয়ে উঠলো শেখর—'শিবলী এদিকে এসো।'

পেছনে তাকিয়ে দেখি একটা দেয়ালের সামনে দাঁড়িয়ে আছে ও। কাছে যেতেই উত্তেজিত হয়ে বললো, 'দেখো, দেখো! কিছু আঁকা ছিলো, কেউ মুছে দিয়েছে।'

মুন্নার সঙ্গে আমিও গেলাম। কাঠের পুল যাওয়ার গলিটার মুখে যে দেয়ালে ট্র্যাক আঁকা ছিলো পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে। চক দিয়ে আঁকা ছিলো। কেউ এমনভাবে সেটা মুছে দিয়েছে যে, কিছুই বোঝার উপায় নেই। কাজটা কাদের, বুঝতে কারো অসুবিধে হলো না। সামনে থেকে দাশু ডাকলো, 'মুন্না, দেখে যাও।'

ডালপট্টির মোড় থেকে হেমেন্দ্র দাস রোডের দিকে ট্র্যাক ছিলো। সেখানকার সব চিহ্ন নির্মমভাবে মুছে ফেলা হয়েছে। খনুদার চ্যালা তখন গাইছে '.....পথে পথে দিলাম ছড়াইয়ারে—এ....।'

মুন্না আমাদের কাউকে কিছু না বলে সোজা খনুদার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো—'দেয়ালের ট্র্যাক মোছা হয়েছে কেন?'

মুন্নার রাগ দেখে খনুদা একটু চুপসে গেলেও তাচ্ছিল্য দেখিয়ে বললো, 'বয়ে গেছে

তোদের ট্র্যাক মুছতে।'

ততক্ষণে আমরা দশ বারো জন স্কাউট ওদের ঘিরে দাঁড়িয়েছি। মুন্না আবার বললো, 'কোন্ দিকে কোন্ ট্র্যাক ছিলো দেখিয়ে দাও। নইলে—'

'নইলে কী করবি।' খনুদার গলায় ভয়ের আভাস।

মুন্না খনুদার চোখে চোখ রেখে বেল্টের হুক থেকে ভাঁজ করা ছুরিটা বের করে খুললো। খনুদার চোখ কপালে উঠলো। আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলো কোথাও দয়ামায়ার লেশমাত্র নেই। কাষ্ঠ হেসে বললো, 'নিকোলাস স্যার বুঝি আজকাল তোদের ছুরি মারামারি শেখাচ্ছেন? ব্রাদার পিটার জানতে পারলে কী খুশিই না হবেন!'

মুন্না বললো, 'শেষবার বলছি, ট্র্যাক কিরকম ছিলো এঁকে দেখাও।'

খনুদার পেছন থেকে একজন মিনমিনে গলায় বললো, 'বারে, দ্যালে কি আঁকা ছিলো আমাদের মনে আছে বুঝি?'

খনুদা কী ভেবে উঠে দাঁড়ালো—'ঠিক আছে দেখাচ্ছি। চান্দু, এক টুকরো ইট আন।'

খনুদার সঙ্গী ইট আনতে গেলো। মুন্নার মুখে জয়ের হাসি। খনুদা রাগ দেখিয়ে গট গট করে হেঁটে গেলো। তরপর হঠাৎ 'চান্দু, পালা'—বলে বাঘের তাড়া খাওয়া ছাগলের মতো চোখের পলকে ছুটে পালিয়ে গেলো। আমরা সবাই হতভম্ব। মুন্নার চাপা হাসি মিলিয়ে গেছে। পেছনে তাকিয়ে দেখি খনুদার বাকি দুই চ্যালা চুপিসারে হাজারীর কেবিনের পেছনের রাস্তা দিয়ে কেটে পড়েছে।

ঠিক তখনই ছাতা বগলে লুঙ্গি পরা একজন বুড়ো পাশ দিয়ে যাবার সময় মৃদু তিরস্কারের গলায় বললোন, 'স্কাউটরা বুঝি কাউরে ছুরি দিয়ে ডর দেখায়!'

মুন্না অপরাধীর মতো সামান্য হাসলো। কী লজ্জার কথা, রাস্তার লোকজন পর্যন্ত দেখে ফেলেছে!

দোকানের ভেতর থেকে বুড়ো হাজারী বেরিয়ে এসে আমাদের লজ্জা ভেঙে দিলেন—'তোমরা ওই বদ ছোঁড়াগুলোকে তাড়িয়েছো দেখে ভারি খুশি হয়েছি বাছারা। পিকনিকে যাচ্ছো বুঝি? একটা করে কুকিজ খেয়ে যাও।'

শিবলী বললো, 'সে কি! না, না—'

'না বললে তো শুনবো না বাছা!' আদুরে গলায় বুড়ো বললেন, 'তোমরা আমার কম উপকার করোনি। ওই ছোঁড়াদোর জ্বালায় দোকানে কোন ভদ্দরলোক আসতে পারে না। কইরে গেদু, কুকিজের টিনটা দিয়ে গেলি না? কাল রাতেই বানিয়েছি। তোমরা খেলে ভারি শান্তি পাবো।'

কাউকে কোনো কথা বলতে না দিয়ে বুড়ো হাজারী বকবক করতে করতে সবার হাতে একটা করে কুকিজ ধরিয়ে দিলেন। একগাল হেসে বললেন, 'কিছু মনে করো না, তোমাদের এতজনকে বসতে দিতে পারলাম না। কী সুন্দর সব ছেলে, দেখলে চোখ জুড়োয়। ঝাঁটা মারো ওই বখাটেদের মুখে। তোমাদের পথের নিশেন বুঝি পাজীগুলো মুছে দিয়েছে?'

শওকত বললো, 'পথ আমরা ঠিকই খুঁজে বের করবো।'

হাজারীর কেবিনের সামনের রোয়াকে বসে কুকিজ খেতে খেতে পনেরো মিনিটের মধ্যে আমরা ট্র্যাক পেয়ে গেলাম। এনামুল সামনে সূত্রাপুরের দিকে দশ মিনিট হেঁটে এসে জানালো ওদিকে কোনো চিহ্ন নেই। ও হেমেন্দ্র দাস রোডের দিকে গিয়েছিলো অমিরা। ওরাও মিনিট পনেরো পরে এসে একই কথা বললো।

'তাহলে আমাদের কাঠের পুলের দিকেই যেতে হবে।' এই বলে শওকত সবার আগে কলুটোলার গলির দিকে এগিয়ে গেলো। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আমরা পরের ট্র্যাক পেয়ে গেলাম। খনুদা আর তার চ্যালারা কখনো স্কাউটিং করেনি। তাদের জানার কথা নয় কোনটা সত্যিকারের ট্র্যাক কিংবা কোন ট্র্যাকের কী মানে। বুঝলাম এর পেছনে ভাইয়ার হাত আছে। লজ্জায় মাথা কাটা গেলো। কথাটা কাউকে বলতে পারলাম না। মুন্না আমার পাশে ছিলো। বললো, 'মুখ ভার করে কী ভাবছিস?'

মুন্নার মুখের দিকে তাকালাম। ওকেও বেশ চিন্তিত মনে হলো। আমি বললাম, 'যাই বলিস, ওভাবে তোর ছুরি বের করা উচিত হয়নি।'

মুন্না ম্লান হেসে বললো, 'আমি একবারও বলেছি কাউকে ছুরি মারবো! আমি শুধু ধারটা পরীক্ষা করেছি। বুড়ো লোকটা ভেবেছে আমি বুঝি সত্যি সত্যি ছুরি মারবো।'

খনুদা যদি নিখিল স্যারকে বলে ভারি কেলেঙ্কারী হবে।

'বলুক না! ও যে অপকর্ম করেছে তার জন্যেও ওকে শাস্তি পেতে হবে। কেউ ওকে কিছু বলার সাহস পায় না বলে মাথায় উঠেছিলো। শুনলি তো হাজারী মশাই কী বললেন? আমার মনে হয় এটাও একটা গুড টার্ন।'

স্কাউটদের গুড টার্ন হলো দিনের মধ্যে একটা ভালো কাজ করতেই হবে, বিশেষ করে যদি কেউ ইউনিফর্ম পরে। গলায় স্কার্ফ বাঁধার সময় নিচে একটা 'গুড টার্ন নট' দিতে হয়—ভালো কাজ না করলে ওটা খোলার নিয়ম নেই।

ট্র্যাক ধরে কাঠের পুল পেরিয়ে ধুপখোলার মাঠ বাঁয়ে রেখে আমরা দীননাথ সেন রোডে ঢুকলাম। শওকত হাতের ঘড়ি দেখে চেঁচিয়ে বললো, 'দশটা বাজতে দশ মিনিট।'

পথে খনুদাদের পেজোমির জন্য দেরি হলেও খানিকটা বিশ্রাম হয়েছে। নিচের ক্লাসের ছেলেদের মুখেও এতটুকু ক্লান্তি নেই।

পনেরো মিনিট পর আমরা সতীশ সরকার রোড ধরে গেণ্ডারিয়া স্টেশনে এলাম। স্টেশনে এসে মনে হলো ট্রেনে করে কোথাও যাবার সংকেত পাবো। সবাই মিলে ট্র্যাক খুঁজতে লাগলাম। প্ল্যাটফর্মের শেষ মাথায় দেখি গেন্ডারিয়া লেখা ফলকের নিচে তিনটে পাথর আমাদের পূর্ব দিকে হাঁটার নির্দেশ করছে।

আর পাকা রাস্তা নয়। দু'ধারে ধান ক্ষেত, মাঝখান দিয়ে কাঁচা রাস্তা। এবার পাথর আর চকের দাগের বদলে গাছের ডাল আর ঘাসের ট্র্যাক।

লম্বা ধানক্ষেত পেরোতে পথে পড়লো একটা গ্রামের মতো। গ্রামের শেষ মাথায় বটগাছের নিচে ছোট একটা মুদি দোকান। সামনে বাঁশের বেঞ্চে বসে কয়েকজন আধবুড়ো লোক হুঁকো টানছিলো। আমাদের দেখে একজন আরেকজনকে বললো, 'মনে অয় বায়স্কোপ কোম্পানির পাট করবার লাইগা যাইতাছে।'

আরেকজন বললো, 'হ, সইন্যের পাট করবো। দ্যাহ না সৈন্যের পোশাক।' 'এত কুট্টি সৈন্য?'

'বায়স্কোপে কুট্টি মাইনষেরেও ডাঙ্গর মনে অয়।'

আমরা হাসি চেপে গম্ভীর মুখে এগিয়ে গেলাম। শিবলী বললো, 'কাছাকাছি নিশ্চয় এ কোনো সিনেমার সুটিং হচ্ছে। আহা যদি ওটা ফাইভ স্টার কোম্পানির রাজনর্তকী হতো।'

শিবলীর এক ভাই ছবি বানায়। তাই ও বেশ খোঁজখবর রাখে। ওর ভাই ছবির জন্যে ফ্রি পাস দেয় আমাদের।

গ্রাম পেরিয়ে আবার ধানক্ষেত। পরের গ্রামে ঢোকার মুখে একটা মসজিদ চোখে পড়লো। সামনে গাছের ছায়া ঢাকা পুকুর। শানবাঁধানো ঘাট। পথের ধারে গাছের গোড়ায় ট্র্যাক ফলো করে একটা চিঠি পেলাম। লেখা আছে 'মসজিদের মাঠে পনেরো মিনিট বিশ্রাম। তারপর রাস্তা ধরে পঞ্চাশ গজ পূর্বদিকে।'

শওকত বললো, 'আমিও বিশ্রামের কথা ভাবছিলাম। মাইল পাঁচেকের মতো হাঁটা হয়ে গেছে।'

ঘড়িতে তখন এগারোটা বাজে। আমরা পুকুরের ঘাটে এসে বসলাম। বেশ চুপচাপ জায়গা। একটা দুটো পাখি ডাকছে অলস গলায়। পুকুরের ওপাশে গোরস্থান। তারপর আবার ধানক্ষেত।

ভেবেছিলাম ছোটরা বুঝি ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। কয়েকজন এখানে-সেখানে বসলেও বেশির ভাগ ছেলে পিঠের হ্যাভারস্যাক খুলে রেখে ছুটোছুটি শুরু করেছে। কয়েকজন টিউবওয়েলের ধারে লাইন দিয়েছে পানি খাবার জন্য। মুন্না সবাইকে পানি তুলে খাওয়াচ্ছে।

আমি বললাম, জায়গাটা ভারি সুন্দর। এখানে ক্যাম্প হলে মন্দ হতো না।'

শিবলী কাষ্ঠ হেসে বললো, 'গোরস্থানের পাশে ক্যাম্পের আইডিয়াটা খারাপ নয়।'

'এতোজন একসঙ্গে থাকবো, ভয় কী!'

'সবাই তো আর রাত জেগে পাহারা দেবে না। পাহারা একজন দু'জনই দেয়।'

'আমি ভেবেছিলাম আমাকে বুঝি রাতে ক্যাম্প পাহারা দিতে হবে না।'

শিবলীর কথা শুনে এরকম জায়গায় ক্যাম্প করার আইডিয়াটা বাতিল করে দিলাম।

এটা ঠিক যে রাতে ক্যাম্প পাহারা দেয়াটাও আমাদের ট্রেনিং-এর একটা অংশ। সাধারণত ওপরের ক্লাসের ছেলেরা পালা করে ক্যাম্প পাহারা দেয়। শিবলীর মতো আমারও গোরস্থানে রাত জাগার সাহস নেই। মনে মনে ভাবলাম ক্যাম্পের জায়গাটা মাইল খানেকের মধ্যে না হলে বাঁচি। যদিও বাইরে বলি ভূত-টুত আমি বিশ্বাস করি না।

পনেরো মিনিট বিশ্রামের পর আবার উঠলাম। পেট্রল লিডাররা সবাই নিজ নিজ পেট্রলের ছেলেদের গুছিয়ে নিলো। পুব দিকের পথে হাঁটা শুরু হলো আবার। গ্রামের পথে এই একটা সুবিধে। শহরের হতো দু'মিনিট পর পর ডাইনে বাঁয়ে গলি ছড়িয়ে নেই। গেন্ডারিয়া স্টেশন ছাড়ার পর পথে মাত্র দুটো রাস্তার ক্রসিং পড়েছে।

ধানক্ষেত পেরিয়ে যে গ্রামটায় ঢুকলাম—রাস্তার একটা বাঁক পেরিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। শিবলী ঠিকই ভেবেছিলো। সামনে পুরনো দিনের বিরাট এক জমিদার বাড়ি। কয়েক জায়গায় পাচিল খানিকটা ভেঙে পড়েছে। দু'পাশে থামের ওপর দুটো সিংহ বসানো বড় গেটের পাশে করুই গাছের ছায়ার নিচে দুটো মাইক্রোবাস আর একটি জিপ। জমিদার বাড়ির ঝুল বারান্দার নিচে একটা এক্কা গাড়ি। জমিদারি পোশাক পরা একজন সেই গাড়িতে বসে। চারপাশে লোকজন ব্যস্ত হয়ে ছুটাছুটি করছে। বুঝলাম সিনেমার স্যুটিং হচ্ছে। শিবলীর কল্যাণে আমাদের অনেকেরই স্যুটিং দেখার অভিজ্ঞতা হয়েছে।

জমিদার বাড়ির সিংদরজার দিকে কয়েক পা এগিয়েছি—হঠাৎ ভেতর থেকে নিকোলাস স্যার ছুটে এসে—'এসে গেছে, এসে গেছে,' বলে আমাকে আর শিবলীকে সামনে পেয়ে জড়িয়ে ধরলেন। তাকিয়ে দেখি দূরে জমিদার বাড়ির আঙিনার ভেতরই আমাদের ট্রুপের পতাকা পতপত করে উড়ছে।

নিকোলাস স্যারের গলা শুনে আমাদের টুপ লিডার আরিফ ছুটে এলো হাসি মুখে। এমন কি সিনেমা কোম্পানির কয়েকজনও এগিয়ে এলো আমাদের দেখতে। শুধু জোসেফকে আশেপাশে দেখলাম না।

অভিশপ্ত বাগানবাড়িতে

দুপুরের খাওয়া শেষ হতে হতে তিনটে বেজে গেলো। ক্যাম্পে এলে যা হয়—প্রথমে তাঁবু খাটানো, তারপর পেট্রলের সবাইকে কাজ ভাগ করে কাউকে দিয়ে শুকনো গাছের ডাল ভেঙে আনা, কাউকে পানি আনতে পাঠানো, কাউকে রেশন তুলতে পাঠানো, কাউকে রান্নার কাজে লাগানো—এসব করতে করতে খাওয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত দম ফেলার সময় থাকে না। রেশনের দায়িত্বে ছিলো জোসেফ। চাল, ডাল, আলু, মাংস, আর মশলা দিয়েছে। আমাদের পেট্রলে প্রথমবার রান্নার ভার পড়েছে আমার ওপর। কাল থেকে রান্না করবে শেখর আর শাহেদ। ওরা যদি সব কিছু ঠিক মতো করে এবার ওদের কুকিং ব্যাজ দেয়া হতে পারে।

সময় বাঁচাবার জন্য আমি চাল-ডাল আর আলু একসঙ্গে নিয়ে খিচুড়ি রেঁধেছি। মাংসটা আলাদা রেঁধেছি কাটা মশলা দিয়ে। নিকোলাস স্যার সবার রান্না দেখে আমাদের উলফ পেট্রলের সঙ্গে বসে খেয়েছেন। আমাদের পাশে শিবলীদের প্যানথার

পেট্রলের রান্না চাখতে গিয়ে তিনি বিষম খেয়েছেন। ওরা লবণ দিতে নাকি ভুলে গিয়েছিলো। কিং ফিশার আর জাগুয়ার পেট্রল মাংস পুড়িয়ে একাকার করে ফেলেছে।

খাওয়ার পর প্লেট, মগ, হাড়ি, পাতিল সব ধুয়ে মুছে মুন্না আর ফারুকের বানানো তাকের ওপর রেখে নিকোলাস স্যারকে ঘিরে বসলাম। সবাইকে ডেকেছেন তিনি।

'জানি! সব কথা শোনার জন্যে সবার প্রাণ আইঢাই করেছে।' মৃদু হেসে নিকোলাস স্যার বললেন, 'আইডিয়াটা আসলে জোসেফের। আমার এক বন্ধুও কিছুটা সাহায্য করেছে। জানোই তো কিভাবে সব হয়েছে। এতে অবশ্য তোমাদের লাভ হয়েছে। এভাবে ট্র্যাক খুঁজে স্পটে এসে অলরেডি একটা পরীক্ষায় পাস করে ফেলেছো। বিশেষ করে খনুদের বাঁদরামো সত্ত্বেও—।"

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'ওদের কথা আপনি কী করে জানলেন?'

রহস্যময় হেসে নিকোলাস স্যার বললেন, 'জোসেফ পুরো রাস্তা তোমাদের ফলো করেছে। জানতাম তোমরা পাস করবে, তবে ফেলও তো করতে পারতে! পথ হারিয়ে গেলে জোসেফ তোমাদের চিনিয়ে দিতো।'

শিবলী উত্তেজিত গলায় বললো, 'আমাদের কেউ জোসেফ ভাইকে দেখলো না, এটা কী করে হয়?'

'দেখেছো হয়তো, চিনতে পারোনি। জো লুঙ্গি পরে ছাতা মাথায় গ্রামের এক বুড়ো সেজে ছিলো যে।' এই বলে নিকোলাস স্যার মুন্নার দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসলেন—'যাই বলো খনুকে ছুরি দেখানোটা বাড়াবাড়ি হয়ে গেছে। তবে ও যা পাজি—আমরা এতে বেশি কিছু মনে করিনি, কি বলো জোসেফ?'

আমি বললাম, 'চিনেছি জো ভাইকে! মুন্নাকে তখন বলেছিলে স্কাউটরা কাউকে ছুরি দেখায় না।'

জোসেফ মৃদু হেসে সায় জানালো।

'এখন বলো জায়গাটা তোমাদের পছন্দ হয়েছে তো?' নিকোলাস স্যার সবার মুখের দিকে তাকালেন।

সবাই একসঙ্গে উচ্ছ্বসিত গলায় চেঁচিয়ে বললো, 'হ্যাঁ, স্যার।'

'এর কৃতিত্ব অবশ্য আমার। নাকি জো?'

জোসেফ এবারও মাথা নেড়ে সায় জানালো। নিকোলাস স্যার বললেন, 'ওদিকে যে সিনেমার সুটিং হচ্ছে, আশা করি তোমাদের চোখ এড়ায়নি। আমার স্কুলের বন্ধু ইরফান খানের ছবির সুটিং ওটা। কাল বিকেলে খবর নিতে গিয়ে জানলাম। অন্য কেউ হলে অবশ্য এখানে ক্যাম্পিং-এর পারমিশন পাওয়া যেতো না। কমিশনার তো আটকেই দিয়েছিলেন প্রায়। ইরফান আগে দুটো সামাজিক ছবি বানিয়ে মার খেয়েছে। এখন 'রাজনর্তকী' নামে একটা ঐতিহাসিক ছবি বানাচ্ছে। গত পনেরো দিনে ধরে এখানে সুটিং করছে। তোমরা বোধহয় জানো না এটা হালুটিয়ার জমিদারদের বাড়ি। এতো বড়ো জমিদার ছিলো যে লোকে ওদের রাজা বলতো। পার্টিশনের পর ওদের বংশধর ইণ্ডিয়া চলে গেছে। গভমেন্ট এটা রিকুইজিশন করে নিয়েছে। সরকারি বাড়ি হলে যা হয়। আর্ধেক জিনিস কেয়ারটেকাররা হজম করে ফেলেছে। চার একর জমির ওপর এই

বাড়ি। অবজারভেশনে গিয়ে দেখে নিও। আমি অনেক আগে ইরফানের সঙ্গে একবার এখানে এসেছিলাম। ও সুটিং-এর জন্য জমিদার বাড়ি খুঁজছিলো। চারপাশে দেখে মনে হয়েছিলো এখানে ক্যাম্প না হোক পিকনিক করতে আনবো তোমাদের। ব্রাদার ফিলিপ্স-এর কথা শুনে জো যখন বললো, শহরের কাছাকাছি একটা স্পট দেখতে, তখন আমি ঠিক করলাম এখানেই আসবো। তখন অবশ্য জানতাম না এখানে ইরফানের সুটিং হচ্ছে। কাল ইরফানকে বলতে ও এক কথায় রাজি। খুশি হয়ে বললো, আমরা থাকলে নাকি ও সাহস পাবে। আজেবাজে কিছু লোক নাকি ক'দিন ধরে ওদের ভয় দেখাচ্ছে।'

ক্লাস সিক্সের মন্টি বললো, 'স্যার, আমরা একদিন সুটিং দেখবো।'

'নিশ্চয়ই!' নিকোলাস স্যার হেসে বললেন, 'তোমরা রাতে ক্যাম্প ফায়ারে ইরফানদের নেমন্তন্ন করো না কেন? ব্রাদার ফিলিপ্সও আসবেন।'

শওকত ভাই বললো, 'ঠিক আছে স্যার, আমি আর শিবলী গিয়ে বলে আসবো। শিবলীর ভাই আফজাল হোসেনকে নিশ্চয়ই উনি চিনবেন।'

শিবলী লাজুক হেসে বললো, 'ইরফান ভাই আমাদের বাসায়ও এসেছেন।'

'এবার তাহলে উঠে পড়ো। ক্যাম্প ফায়ারে কারা কী করবে ঠিক করে নাও।' এই বলে নিকোলাস স্যার তাঁর ক্যাম্পে চলে গেলেন।

আমরা সবাই জোসেফকে নিয়ে পড়লাম। 'তোর পেটে পেটে এত—আগে যদি জানতাম।'—বলে ওকে জড়িয়ে ধরলো শওকত।

শিবলী বললো, 'তুমি কি গ্রামের বুড়ো সেজেও এমন দামী চশমা পরেছিলে?'

জোসেফের চশমার ফ্রেমটা বেশ দামী। গতবার এথেন্স থেকে এনেছে।

সদা গম্ভীর জোসেফ লাজুক হেসে বললো, 'না চশমা পরিনি। সেজন্য ছাতা ঠুকে রাস্তায় হাঁটাটা বেশ রিয়ালিস্টিক হয়েছিলো।'

'দাড়ি কোত্থেকে ম্যানেজ করলে?' জানতে চাইলো এনামুল।

'নিখিল স্যারের নাটকে আমার পার্টি ছিলো বুড়ো মাঝিটার—যে একুল ভাঙে ওকুল গড়ে গায়।' ভাবলাম স্টেজে যখন উঠবো না তখন দাড়িটা আর নষ্ট করি কেন? ওটা আগেই দিয়েছিলেন নিখিল স্যার।'

শেখর বললো, 'তোমার দাড়ি না থাকলে হাজারীর কাছ থেকে কুকিজ খেতে পেতে।'

জোসেফ বললে, 'ওটাও দেখেছি।'

ট্রুপ লিডার আরিফ বললো, 'তোমরা কিন্তু ক্যাম্প ফায়ারের জন্য বেশি সময় পাচ্ছো না। রাতের রান্না রেডি করার সঙ্গে সঙ্গে কারা কী করবে ঠিক করে ফেলো। স্যার যে তাঁর বন্ধু ইরফান সাহেবকে নেমন্তন্ন করতে বলেছেন মনে আছে তো?'

শওকত উঠে দাঁড়ালো—'চলো শিবলী, নেমন্তন্নটা করে আসি।' এই বলে শিবলীকে নিয়ে ও জমিদার বাড়ির দিকে গেলো। আর পেট্রল লিডাররা সবাই নিজের ছেলেদের নিয়ে তাঁবুতে ঢুকলো।

মাঠের চারপাশে গোল করে সাজানো চোদ্দটা তাঁবু। বারোটা পেট্রোলের জন্য

বারোটা, নিকোলাস স্যার আর গেস্ট কেউ এলে তাদের জন্য একটা—বাকিটা রেশনের জিনিসপত্র আর ট্রুপ লিডার আরিফের। মাঠটার তিন দিকেই ঘন গাছপালা। এক সময় বুঝি ফলের বাগান ছিলো। যত্নের অভাবে জংলী লতা আর ঝোপঝাড়ে বোঝাই। সন্ধ্যে না হতেই ঝিঁঝি ডাকতে শুরু করেছে। একপাশে পুকুর, দু'দিকে দুটো শান বাঁধানো ঘাট। একটা ঘাট জমিদার বাড়ির দিকে, আরেকটা আমাদের মাঠের দিকে। ক্যাম্পিং স্পট হিসেবে জায়গাটা যে মৌচাকের চেয়েও সুন্দর একথা মানতেই হবে। হতে পারে জঙ্গল নেই কিন্তু যা আছে কোন, তা অংশে কম নয়। বিশেষ করে পুকুরটা ছিলো চমৎকার।

তাঁবুতে ঢোকার পর পেট্রল লিডার এনামুল আমাকে বললো, 'রান্টু, ক্যাম্প ফায়ারে কী করবে ভেবেছো?'

বললাম, 'আজ আমরা নাটক করবো।'

'ঠিক করে ফেলো তাহলে। আমি স্যারের কাছে যাচ্ছি।'

তখন জসিমউদ্‌দীনের বাঙ্গালির হাসির গল্প নতুন বেরিয়েছে। আট দশ মিনিটের অভিনয়ের জন্য চমৎকার সব গল্প ছিলো ওটাতে। ছটা চরিত্র আছে এমন একটা গল্প সবাইকে বলে কে কোন পার্ট করবে ঠিক করে সংলাপ মুখস্থ করলাম। ফারুকের তিনটা সংলাপ বড় ছিলো বলে লিখে নিলো। বৌ-এর পার্ট শেখর করবে। ওর মায়ের একটা শাড়ি আনতে ওকে আগেই বলে রেখেছিলাম। আমি এনেছি দাড়ি, গোঁফ, টুপি। জানতাম জোসেফের জাগুয়ার পেট্রল আর বান্টিদের ডিয়ার পেট্রল ছাড়া আর কেউ নাটক করবে না। প্যাট্রিক, রঞ্জিত আর নঈমরা মাত করবে গান দিয়ে। দেখা যাক কারা ফার্স্ট হয়।

এনামুল স্যারের সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছিলো—আমাদের টেন্ডার ফুট আর সেকেন্ড ক্লাসদের কোন কোন পরীক্ষা নিতে হবে। আমাদের পেট্রলে এনামুল আর আমি ফার্স্ট ক্লাস স্কাউট, ফারুক, মুন্না সেকেন্ড ক্লাস, বাকি সবাই টেন্ডার ফুট।

দশ মিনিটের ছোট্ট নাটকটা দু'বার মহড়া দিয়ে আমি আর শেখর রাতের রান্না চাপিয়েছি—শিবলী এসে ডাকলো, 'রান্টু, কথা শুনে যা।'

উত্তেজনায় চক চক করছিলো শিবলীর চোখ দুটো। কাছে যেতেই ফিস ফিস করে বললো, 'জানিস ইরফান ভাই কী বলেছে?'

'কী বলেছে?' অবাক হয়ে আমি জানতে চাইলাম।'

'এই বাগান বাড়িতে নাকি ভূত আছে।'

'কী আবোল-তাবোল বলছিস?'

'অনেক কাণ্ড ঘটেছে।' গলাটা আরেক ধাপ নামিয়ে শিবলী বললো, 'রাতে বলবো তোকে। আরিফ ভাই বলেছে তোকে আর আমাকে রাতের প্রথম দু'ঘন্টা ডিউটি দিতে।'

ক্যাম্পে গেলে প্রত্যেক পেট্রলকে পালা করে রাতে পাহারা দিতে হয়। এটাও পরীক্ষার একটা। শিবলী সেকেন্ড ক্লাস বলেই এবারের ক্যাম্পিং-এ ওকে এই পরীক্ষা দিতে হবে। পাশ হলে পরের বার অন্য কোনো সেকেন্ড ক্লাসের সঙ্গে থাকবে। নতুনদের রাতের ডিউটি দিতে হয় না। পাহারা যতো না বাইরের চোরের জন্য, তার চেয়ে বেশি

ভেতরের জন্য। পাহারাদাররা কতটুকু সতর্ক যাচাই করে দেখার জন্য নিকোলাস স্যার কিংবা ট্রুপ লিডার আরিফ রাতে চুরি করতে বেরোন। সকাল বেলা রিপোর্ট করতে হয় কারো কিছু খোয়া গেলো কি-না। তখন দেখা যায় থলের ভেতর থেকে হারানো জিনিসটি বের করে দিচ্ছেন নিকোলাস স্যার। বলেন কাদের পাহারার সময় কিভাবে চুরি করেছেন।

রাতের খাওয়া শেষ করে আমরা সবাই গোল হয়ে বসে ক্যাম্পফায়ারের জন্য স্তুপ করে রাখা গাছের শুকনো ডাল-পাতায় আগুন ধরালাম। জোসেফ গম্ভীর গলায় উদ্বোধন করতে গিয়ে বললো, 'এই আগুনের শিখার মতো আমাদের ভেতর যা কিছু সুন্দর আছে উর্ধ্বে উঠুক, অন্যদের আলোকিত করুক, আর যা কিছু অসুন্দর আছে পুড়ে ছাই হয়ে যাক।' এরপর নঈমের সঙ্গে কোরাসে সবাই 'ক্যাম্পফায়ার ইজ বার্নিং' গাইলাম।

গান শেষ হতেই নিকোলাস স্যারের সঙ্গে দু'জন অতিথি এসে আমাদের পাশে বসলেন। একজন ইরফান ভাই, আরেকজন ব্রাদার ফিলিক্স। লাজুক হেসে ব্রাদার বললেন, 'আইয়া পড়ছি। আমি তমাগ অতিথ। খেদাইয়া দিও না কইলাম।'

আমরা সবাই হইচই করে বললাম, 'যতদিন খুশি আপনি আমাদের সঙ্গে থাকুন। কেউ কিছু বলবে না।'

কে যেন বললো, "এখানে কি নিখিল স্যার আছেন যে কিছু বলবেন!"

আমি বললাম, 'আমরা আপনাকে নাটকও করতে দেবো। আপনি সুন্দর বাংলা বলেন। আমাদের নাটকের জন্য চমৎকার হবে।'

নইম বললো, 'আমাদের সঙ্গে গানও গাইতে হবে।'

'কতা হোন পোলাগো।' হা হা করে হাসলেন ব্রাদার ফিলিক্স—'আমারে ডর দেখাইতে পারবা না। আমি কইলাম সব পারি। খালি আমারে রানতে কইও না। ওইটা আমারে দিয়া হয় না।'

শিবলী বললো, 'ইরফান ভাই কি করবেন, নাটক না গান?'

'করবে তো তোমরা।' মৃদু হেসে ইরফান ভাই বললেন—'আমি শুধু দর্শক।'

নিকোলাস স্যার বললেন, 'উহু! এভাবে এড়ানো যাবে না ইরফান। ব্রাদার ফিলিক্স যদি পারেন—তুমি পারবে না, এটা একটা কথা হলো? স্কুলে তুমিও স্কাউট ছিলে।'

হাসতে হাসতে ইরফান ভাই বললেন, 'ঠিক আছে, ব্রাদার যা পারবেন না আমি তাই করবো। একদিন তোমাদের সবাইকে আমরা রান্না করে খাওয়াবো।'

সবাই একসঙ্গে হেসে উঠলো। কে যেন বললো, 'থ্রি চিয়ার্স ফর ইরফান ভাই।'

সবাই একসঙ্গে বললাম, 'হিপ হিপ হুররে।'

'থ্রি চিয়ার্স ফর ব্রাদার ফিলিক্স।'

'হিপ হিপ হুররে।'

সামনে শুকনো কাঠে তখন দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছে। ডিসেম্বরের কুয়াশাভরা ঠাণ্ডা রাতে খোলা আকাশের নিচে বসে আছি সবাই এক উৎসবের পরিবেশে। সবার গায়ে গরম কাপড়। মুখে আগুনের লাল ছায়া কাঁপছে। খুশিতে চকচক করছে সবার চোখ। ক্যাম্পিং-এর সবচেয়ে আনন্দের পর্ব হচ্ছে রাতের এই ক্যাম্প ফায়ার।

উচ্ছ্বাসভরা কোলাহল একটু কমতেই ব্রাদার বললেন, 'তোমরা কারা কি করবা থইলার মইধ্যে থেইকা বাইর কর। দেখি নিখিল স্যারের পোলাগো ধারে কাছে যাইতে পার কি-না!'

সবাই আরেক দফা হইচই করে উঠলো। ট্রুপ লিডার আরিফ ঘোষণা করলো—'সবার আগে লোপার্ড পেট্রল।'

অর্থাৎ নঈম আর রঞ্জিতদের পেট্রল। ওদের পেট্রলের শফিক চমৎকার মাউথ অর্গান বাজায়। ও মাউথ অর্গানে সুর তুলতেই ওরা প্রথমে গাইলো, 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা।' শেষ হওয়ার পর বিটের ওপর কোরাসে ধরলো হাল্কা ফুর্তির গান, 'সিঙ্গিং আই আই আই ইপ্পি আই।' গান শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই তালে তালে তালি বাজাতে লাগলো। গান শেষ হওয়ার পরও সেই তালি আর থামে না।

এরপর জোসেফদের জাগুয়ার পেট্রল। ওদের পেট্রলের সীমার চার বছর ধরে বাফাতে নাচ শেখে। জোসেফরা কোরাসে গাইলো 'কারার ওই লৌহকপাট।' গানের সঙ্গে মাথায় লাল ফেটি আর কোমরে গামছা বেঁধে দারুণ নাচলো সমীর। ইরফান ভাইর চেহারা দেখে মনে হলো এমনটি তিনি আশা করেননি।

জাগুয়ারের পর আমাদের পালা এলো। আমাদের নাটকে মেকাপ দরকার ছিলো আমার আর শেখরের। আমার পার্ট ছিলো এক লোভী মোল্লার আর শেখর করেছিলো চাষী বৌ-এর পার্ট। লেপার্ডদের গানের সময় আমরা দুজন এক ফাঁকে তাঁবুতে গিয়ে ঝটপট মেকাপ নিয়ে সবার পেছনে অন্ধকারে বসেছিলাম—কেউ টেরও পায়নি। বাকিদের মেকাপ দরকার ছিলো না। লুঙ্গী-গেঞ্জি বা জামার ওপর চাদর গায়ে বসেছিলো ওরা। আমাদের নাম ঘোষণার পর প্রথমে মুন্না চাদর রেখে উঠে গেল।

'বৌ কই গেলা, অ বৌ!' মুন্নার এই সংলাপের পর কনে বৌ সাজা শেখর এলো 'এইতো আমি চিল্লান ক্যান—' বলতে বলতে। ফর্শা মেয়েলি চেহারার শাড়ি পরা শেখরকে প্রথম চিনতে না পেরে সবাই দারুণ চমকে উঠেছিলো। কয়েক মুহূর্তে কোথাও কোনো শব্দ নেই। তবে সেটা বড় জোর পনেরো সেকেন্ডর জন্য। যখন বুঝলো বৌটি আসলে শেখর তখন হুল্লোড় আর তালির ঝড় বয়ে গেলো। যার ফলে মুন্না আর শেখরকে দুবার করে চেঁচিয়ে সংলাপ বলতে হলো। এরপর হুল্লোড় উঠলো কাঠমোল্লার মেকাপে আমাকে দেখে। আমাদের কথা শুনে আর কাণ্ড-কারখানা দেখে সবাই গড়িয়ে পড়লো। নাটক শেষ হবার পরও হো হো, হি হি হাসি আর থামে না। তখনই বুঝলাম আমাদের ছাড়িয়ে যাওয়া অন্যদের পক্ষে কঠিন হবে।

শেষ পর্যন্ত হলোও তাই। আমাদের আইটেমের পর কেউ গান গাইলো, কেউ আবৃত্তি করলো, কেউ নাটকের অংশ বিশেষ করলো, কিন্তু কোনওটাই আমাদের মতো হলো না। শেষ হওয়ার পর নিকোলাস স্যার দাঁড়িয়ে বললেন, 'আমাদের এখানে অতিথি হিসেবে বিশিষ্ট চিত্র পরিচালক ইরফান খান আছেন। আমাদের সংস্কৃতির জগতে যাঁকে সবাই এক নামে চেনেন। আমি তাঁকে অনুরোধ করবো তাঁর বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান কোন্‌টি তিনি যেন অনুগ্রহ করে ঘোষণা করেন।'

লাজুক হেসে ইরফান ভাই উঠে দাঁড়ালেন। বললেন, 'তোমরা সবাই এত সুন্দর

অনুষ্ঠান করেছো যে আমি রীতিমতো অভিভূত হয়ে গেছি। সত্যি বলছি, এতটা সুন্দর কাজ আমি আশা করিনি। জানোই তো আমি ছবি বানাই। আমি হলপ করে বলতে পারি তোমাদের কয়েকজনের অভিনয় দেখে আমার মনে হয়েছে আমাদের সিনেমার অনেক দামী স্টারও এতটা সহজ-সুন্দর স্বাভাবিক অভিনয় করতে পারবে না। (প্রচণ্ড তালি আর হুল্লোড়) আমি নিজে গাইতে বা নাচতে না জানলেও ভালো কোন্‌টা সেটা বিলক্ষণ বুঝি। সারাক্ষণ আমাকে এ নিয়েই থাকতে হয়। তোমাদের স্যার—নিকোলাস রোজারিও আমার স্কুলের বন্ধু। স্কুলে আমরা একসঙ্গে স্কাউটিং করতাম। আজ মনে হচ্ছে তোমাদের স্কাউটিং-এর বাইরে অভিনয়, নাচ, গান কিংবা বাজানো ও যেভাবে শিখিয়েছে, আমাদের লাইনে এলে বেশি নাম করতে পারতো।'

কথার মাঝখানে এমন হুল্লোড় আর তালি বাজলো যে ইরফান ভাইকে থামতেই হলো। পেছন থেকে কে যেন চেঁচিয়ে বললো, 'ব্রাদার ফিলিপ্স এবার কিছু বলুন।'

ব্রাদার বললেন, 'ওনারে শ্যাস করতে দাও। ওনার বন্ধুর কথা উনিত কইবেনই। আমি ওনার কথা নিখিল স্যারেরে গিয়া কমু, দেখি হ্যারে পটান যায় কি-না। আপনে কন ইরফান ভাই, আমরা শুনতাসি।'

ইরফান ভাই হেসে বললেন, 'না, বন্ধু বলে বলছি না ব্রাদার। নিকোলাস সত্যি গুণী ছেলে।'

ব্রাদার ফিলিপ্স বিরক্ত হওয়ার ভান করলেন—'আহা, এক কথা কতবার কইবেন! এই হগল কথা নিকোলাস স্যারের সামনে না কওনই ভাল। ফার্স্ট কে হইসে আপনি হেই কথা কন।'

হাসতে হাসতে ইরফান ভাই বললেন, 'ঠিক আছে, নিকোলাসের কথা আর বলবো না। তবে ফার্স্ট কে হয়েছে বলা খুব কঠিন। নিয়ম রক্ষার জন্য যদি বলতেই হয় তাহলে আমি বলবো দলগত কাজ সবচেয়ে ভালো হয়েছে উলফ পেট্রলের আর একক কাজে ফার্স্ট হয়েছে জাগুয়ার পেট্রলের সমীর।'

ইরফান ভাই থামতেই আরেক দফা তালি আর হুল্লোড়। সমীরকে নিয়ে শুরু হলো লোফালুফি। শেখরকে ধরার আগে ও দৌড়ে পালালো। হট্টগোলের ভেতর ট্রুপ লিডার আরিফ ক্যাম্প ফায়ারের সমাপ্তি ঘোষণা করলো। আগুন নিভিয়ে আমরা সবাই যখন তাঁবুতে ফিরে গেলাম, রাত তখন দশটা বাজে।

সবাই বিছানা পেতে শোয়া মাত্র ঘুমিয়ে পড়লো, শুধু জেগে রইলাম আমি আর শিবলী। দুজন গিয়ে পুকুর ঘাটে বসলাম। নিকোলাস স্যার আর আরিফের তাঁবুটা ঘাটের কাছে। নজর রাখতে সুবিধে হবে। বাইরের কেউ এলেও যেতে হবে ঘাটের পাশ দিয়ে।

দু'তিন দিন আগে বোধহয় পূর্ণিমা ছিলো। সামান্য লালচে ক্ষয়াটে গোল চাঁদ তখন ঠিক মাথার ওপর। জ্যোৎস্নার আলো মাখা কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে গোটা মাঠ। ক্যাম্পগুলো মনে হচ্ছে দ্বীপের মতো। আমরা যেখানে বসেছি পাশের আমগাছের ছায়া সেখানে পড়েছে। বাইরে থেকে কেউ আমাদের উপস্থিতি টের পাবে না।

শিবলী চাপা গলায় বললো, 'শুনে ভয় পাবি না তো?'

আমি একটু বিরক্ত হয়ে বললাম, 'আমার ভূতের ভয় নেই। কী বলবি বল!'

'আমার কিন্তু বলতেই ভয় লাগছে।' মুখে এ কথা বললেও বলার জন্য ও ভেতরে ভেতরে সন্ধ্যে থেকেই ছটফট করছে। আমি নির্লিপ্ত গলায় বললাম, 'ভয় পেলে বলিস না।'

শিবলী আমার গা ঘেঁষে বসে বললো, 'শোন, ইরফান ভাইর ওখানে যা শুনলাম।' একটু থেমে আশেপাশে দেখে নিয়ে গলাটা আরেক ধাপ নামালো—'হালুটিয়ার জমিদারদের পঞ্চম পুরুষ মারা গেছেন পঞ্চাশ বছর আগে। গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। মরবার আগে নিজের বৌকে আর লক্ষ্ণৌ থেকে আনা এক বাইজীকে গুলি করে মেরেছেন। এখনো নাকি তাদের প্রেতাত্মা এই বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। ইরফান ভাইদের প্রোডাকশনের দাশুবাবু, বাবুর্চি মজিদ ঘুঙুরের আওয়াজ শুনেছে। সাইড হিরোইন হেলেন পরশু রাতে ওর ঘরে দেখেছে সাদা কাপড় পরে কাকে ঘুরে বেড়াতে। কে বলতেই অন্ধকারে কর্পূরের মতো মিলিয়ে গেছে। ব্যাস, চিৎকার করে মুর্ছা, সকালে জ্ঞান ফিরতেই সুটিং ফেলে বাড়ি চলে গেছে। ইরফান ভাই মহাবিপদে আছেন। সুটিং-এর জন্য দুটো ঘোড়া এনেছিলেন ভাড়া করে। কাল রাতে ঘোড়া দুটো গায়েব হয়ে গেছে। ওদের ইউনিটের সবাই বেশ ভয়ে ভয়ে আছে। কে জানে কখন কার কপালে কী আছে। ইরফান ভাই বলছিলেন, 'এত টাকা-পয়সা খরচ করে মাঝপথে যদি এভাবে চলে যেতে হয়, তিনি পথে বসবেন।' এই বলে শিবলী একটু থামলো। ঢোক গিলে বললো, 'কী ভয়ের কথা বল তো! নিকোলাস স্যার আমাদের এমন এক জায়গায় আনলেন ক্যাম্প করার জন্য—কখন যে কী হয়!'

আমি বললাম, 'নিকোলাস স্যার কী করে জানবেন?'

'সে কথাই তো আমি ইরফান ভাইকে বলেছিলাম।' শিবলী অধৈর্য গলায় বললো। 'সব শুনে আমি ওঁকে বললাম, এই কথাগুলো নিকোলাস স্যারকে আগে বললেই তো পারতেন। তিনি বললেন, সময় পেলাম কোথায়। নিকোলাস এসে পাঁচ মিনিটও তো বসলো না।'

'কথাগুলো তোকে ইরফান ভাই বলেছেন, না অন্য কারো কাছে শুনেছিস?' জানতে চাইলাম আমি।

'ওদের প্রোডাকশন ম্যানেজার দাশু বাবু বলেছেন। ইরফান ভাইর সামনেই বলেছেন। আমাদের সাবধানে থাকতে বলেছেন ইরফান ভাই।'

'আত্মহত্যার গল্পটি দাশুবাবু কোত্থেকে শুনেছেন?'

'আহ, গল্প বলছিস কেন?' শিবলীর গলায় রাগের আভাস। 'গ্রামের সবাই জানে এই ঘটনা। তুই বলতে চাস গ্রামে সত্তর-আশি বছরের বুড়ো নেই?'

'তা থাকবে না কেন? আমি সে কথা বলিনি। স্যার যে বলেছিলেন একজন কেয়ারটেকার নাকি আছে, ভূতেরা কি তার ওপর কখনো হামলা করেনি?'

'কে বলেছে কেয়ারটেকার এখানে থাকে? কেয়ারটেকার থাকে ফতুল্লা। মাঝে মাঝে এসে দেখে যায়। দারোয়ান আর মালি আছে। ওরা সাতদিনে একবার এসে ঘর দোর পরিষ্কার করে রেখে যায়। কেউ এখানে থাকে না।'

শিবলী যা বললো ভাববার মতো কথা বটে। আমাদের ক্লাসে শুভদারঞ্জন স্যার অনেকবার বলেছেন, কারো যদি অপঘাতে মৃত্যু হয়, তাহলে তার আত্মার নাকি মুক্তি হয় না। যেখানে মরেছে তার আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। সবাই নাকি তাদের দেখে না, তবে কেউ কেউ দেখে। বিশেষ করে যেসব মানুষের আধ্যাত্মিক শক্তি আছে তারা সব দেখতে পায়। নিকোলাস স্যারকে একবার জিজ্ঞেস করতে তিনি হেসে উড়িয়ে দিয়েছেন। বলেছেন, 'ভূত কেউ দেখেছে বলে তো শুনিনি। ভূত যদি সত্যি সত্যি থাকতো তাহলে দিনের আলোতেও ওদের দেখা যেতো।' নিকোলাস স্যার মাঝে মাঝে নাস্তিকের মতো কথা বলেন। ওঁদের নিয়ে এভাবে রসিকতা করা ঠিক নয়। সব আত্মাই যে ভালো তা তো আর নয়। কিছু বদমেজাজী খারাপ আত্মাও আছেন। ওঁরা কুপিত হলে ভয়ানক বিপদ।

পুকুরের ওপারে তাকিয়ে দেখলাম, চাঁদ আর কুয়াশার আলো-ছায়া সারা গায়ে মেখে নিশ্চল দাঁড়িয়ে আছে দেড়শ বছরের পুরোনো জমিদার বাড়িটা। সুটিং কোম্পানির সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। ঝুল বারান্দার নিচে কম পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বলছে।

শিবলী বললো, 'তোর কি মনে হয় সত্যি এরকম কোনও আত্মা এ বাড়িতে আছে?'

আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'তোর কী মনে হয়?'

'থাকাটাই তো স্বাভাবিক। খুন করা, আত্মহত্যা করা এগুলো তো স্বাভাবিক মৃত্যু নয়। শুভদারঞ্জন স্যার কী মিথ্যে কথা বলেছেন?'

আমি আস্তে আস্তে বললাম, 'মানুষের তো ভুল হতে পারে।'

এ কথাটা নিকোলাস স্যারই একদিন বলেছিলেন আমাকে—'যারা ভয় পায় তারাই ওসব দেখে।'

শিবলী রেগে গেলো—'তুই পারবি একা এই বাড়িতে রাতে থাকতে?'

'না, তা পারবো না।' কথাটা আমাকে স্বীকার করতে হলো। অতৃপ্ত প্রেতাত্মা ছাড়াও এসব পুরোনো বাড়িতে সাপ-খোপ-বিছে নানারকম উৎপাত থাকতে পারে।

হঠাৎ চাপা গলায় শিবলী বললো, 'দ্যাখ দ্যাখ, ওখানে ওটা কী?'

আমি চমকে ওঠে দূরে বাগানের ভেতর দেখলাম আলোর মতো কী যেন তিন-চার পা হেঁটে নিভে গেলো। দু'জন অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম সেদিকে। চোখে পড়ার মতো কিছুই দেখলাম না। শিবলী ভয় পাওয়া গলায় বললো, 'নিজের চোখেই তো দেখলি।'

আমি বিজ্ঞের মতো বললাম, 'ওটা আলেয়ার আলো। ক্লাস সিক্সের সাধারণ বিজ্ঞানের বইতে পড়িসনি? পুরোনো জলাটলা থাকলে সেখনে আলেয়ার আলো দেখা যায়। জলার ভেতর মনে হয় হেঁটে বেড়াচ্ছে ওটা।'

মাথার ওপর আমগাছে হুতোম প্যাঁচা ডাকলো। সঙ্গে সঙ্গে ঝটপট করে দুটো বাদুড় উড়ে গেলো জমিদার বাড়ির দিকে। শিবলী আরো গা ঘেঁষে বসলো।

শীতও পড়েছে ভীষণ। মোটা পুলোভার, বাবার বাঁদুরে টুপি, পায়ে উলের মুজো পরেও কাঁপুনি থামানো যাচ্ছিলো না। তবে শিবলীর কাঁপুনি কতটা শীতের সেটা বলতে পারবো না। দুঘন্টা পর টাইগার আর জাগুয়ার পেট্রলের দুজনকে তাঁবু থেকে বেরোতে

দেখে কী যে আনন্দ হলো। আমি আর শিবলী যে যার তাঁবুতে গিয়ে কম্বলের নিচে ঢুকেই গভীর ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

আনন্দময় তাঁবুর দিন

সকালে বিউগলের শব্দে যখন ঘুম ভাঙলো বাইরে তখন ঘন কুয়াশার দেয়াল। পেট্রল লিডার এনামুল বললো, 'এখন ছটা বাজে। আশা করি এক ঘন্টার ভেতর আমরা পিটি করা জন্য তৈরি হতে পারবো।'

ক্যাম্পিং-এর অভিজ্ঞতা শাহেদ আর শেখর ছাড়া আমাদের সবারই ছিলো। এক বছর ধরে ওরা দুজন স্কাউটিং করছে। টেণ্ডারফুট ব্যাজ পেয়ে গেছে। এবারে ট্রেনিং ঠিকমতো পারলে সেকেণ্ড ক্লাস ব্যাজ পাবে। ফারুক আর মুন্না সেকেণ্ড ক্লাস স্কাউট। ওদের জন্যেও এবারের ক্যাম্পিং যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। গোটা ট্রুপে একমাত্র আমি ক্লাস এইটে থাকতে ফার্স্ট ক্লাস ব্যাজ পেয়েছি। বেশির ভাগ ট্রেনিং আমার হয়ে গেছে। শুধু গায়ে জোর কম বলে কিছু কাজ ভালো পারি না, যেমন কিনা মাঙ্কি পোল বানানো।

শেখরকে বললাম মুখ হাত ধুয়ে চায়ের আয়োজন করতে, শাহেদকে বললাম ক্যাম্প গোছাতে আর মুন্না ফারুককে দিলাম হাঁড়ি পাতিল মেজে গেজেট সাজাবার দায়িত্ব। সাতটার সময় নিকোলাস স্যার আসবেন ক্যাম্প পরিদর্শনে।

কনকনে শীতে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে পুকুরের পানিতে মুখ-হাত ধুলাম। ক্যাম্পিং স্পট বাছার সময় খেয়াল রাখতে হয় কাছাকাছি পুকুর বা নদী আছে কি-না। সবারই তাড়া ইন্‌স্পেকশনের জন্য সব কিছু আগে থাকতেই সাজিয়ে গুছিয়ে তৈরি রাখতে হবে।

নাশ্‌তার জন্য ভাঁড়ার থেকে রুটি, ডিম আর কলা দেয়া হয়েছিলো। শেখর ডিমগুলো ধুয়ে চায়ের পানিতেই সেদ্ধ করে নিলো। ক্যাম্পে এলে রান্না নিজেদের করতে হয়। রান্না করার চুলোটা নিজেদের বানাতে হয়। চুলো মানে গ্রামে যেমন বানায় মাটি দিয়ে-তেমন কিছু নয়। এক টুকরো বাঁশ বা গাছের সোজা ডালের দু'মাথায় ইংরেজি অক্ষর A এর মতো ডাল দিয়ে দুটো বানিয়ে বেঁধে নিলেই হলো। হাঁড়ি পাতিলের কানায় দাড়ি দিয়ে বেঁধে সোজা ডালের সঙ্গে ঝুলিয়ে নিচে আগুন দিতে হয়। হিসেব আরো আছে। ক্যাম্প থেকে একটু দূরে বাতাস কোন্ দিকে বইছে সেটা দেখে চুলো বানাতে হয়।

চুলোর পাশে থাকে হাড়ি, পাতিল, প্লেট আর ক্যান্টিন রাখার গেজেট। একপাশে থাকে ভেজা কাপড় শুকোবার জন্য বা তোয়ালে রাখার গেজেট। কেউ ভেতরে কম্বল বালিশ রাখার জন্যও গেজেট বানাতে পারে। দেখতেও ভারি সুন্দর হয়। আমাদের ক্যাম্পের সবগুলো গেজেট মুন্নারা বানিয়েছে।

সাতটা বাজার দশ মিনিট আগেই আমাদের সব গোছানো হয়ে গেলো। ইউনিফর্ম পরে পরিপাটি হয়ে ক্যাম্পের আশেপাশে ঘুরে দেখছি কোথাও কোনও ময়লা বা বাতিল কিছু পড়ে আছে কি-না। মুন্নারা ময়লা ফেলার জন্য গাছের ছোট ডাল আর শুকনো তালপাতা দিয়ে ঝুড়ি পর্যন্ত বানিয়েছে, অন্য কোনো পেট্রল যা ভাবতেও পারবে না। অবশ্য ময়লা ফেলার গর্তও নিয়মমাফিক করা হয়েছে।

নিকোলাস স্যারকে তাঁবু থেকে বেরোতে দেখে পেট্রল লিডার আমাদের এ্যাটেনশন করিয়ে দিলো। মার্চ করে সবাই মাঠের মাঝখানে এলাম। ট্রুপ লিডার আরিফ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করলো। আমরা সেল্যুট দিয়ে অভিবাদন জানিয়ে এক মিনিট নীরবে প্রার্থনা করলাম। তারপর আবার মার্চ করে ফিরে গেলাম যার যার তাঁবুর সামনে। ঠিক সোয়া সাতটায় শুরু হলো তাঁবু পরিদর্শন। নিকোলাস স্যারের সঙ্গে ব্রাদার ফিলিপ্স আর ট্রুপ লিডার আরিফও ছিলো। রাতে ব্রাদার ছিলেন নিকোলাস স্যারের তাঁবুতে। খেয়েছেন প্যান্থার পেট্রলের সঙ্গে।

একে একে সাতটা তাঁবু দেখে নিকোলাস স্যার আমাদের তাঁবুতে ঢুকলেন। ছোট্ট একটা শব্দ তাঁর মুখ দিয়ে বেরুলো—'বাহ্।' ব্যস, এতেই আমরা ভেতরে ভেতরে খুশিতে ফেটে পড়লাম।

ভোরে দাঁত মাজতে বেরিয়ে অন্যদের গেজেটও দেখেছি। তখনই বুঝেছি আমরা ফার্স্ট হবো। নিকোলাস স্যার সব কিছু খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখলেন। এমন কি আমাদের হাতের নখ পর্যন্ত তাঁর ইন্সপেকশন থেকে বাদ গেলো না।

বাকি তাঁবু দেখা শেষ করে নিকোলাস স্যার মাঠের মাঝখানে দাঁড়ালেন। বললেন, 'আমাদের তাঁবু পরিদর্শন শেষ হয়েছে। সব কিছু মিলিয়ে আমাদের বিচারে ফার্স্ট হয়েছে উলফ পেট্রল।'

ট্রুপ লিডার আরিফ স্যারের পেছনে ফুল সুদ্ধো জবার একটা ডাল এনে দাঁড়িয়েছিলো। স্যারের ঘোষণা শেষ হওয়ার পর সেই ডালটা এনে তুলে দিলো আমাদের পেট্রল লিডার এনামুলের হাতে।

স্যার বললেন, 'আমরা সবাই এবার ইয়েল দেবো। অভিনন্দন জানাবো উলফ পেট্রলকে।'

আরিফ চেঁচিয়ে বললো, 'বি।'

'আমার ছাড়া সবাই কোরাসে বললো, 'বি।'

'আরিফ বললো, 'আর।' কোরাসে-'আর।' আরিফ-'এ'। 'কোরাসে-এ। আরিফ-'ভি।' কোরাস-'ভি।' আরিফ-'ও।' কোরাস-'ও।' আরিফ-'ব্রাভো।' কোরাস-'ব্রাভো।'

এভাবে ওরা তিনবার বললো, 'ব্র্যাভো।' এরপর আমাদের ইয়েল। আমরা লাইন

ধরে দাঁড়িয়েছিলাম। একজন একটা করে পাঁচটা অক্ষর পর পর বলে গেলাম—'টি-'এইচ-এ-এন-কে।' সবার শেষে এনামুল বললো, 'ওয়াই-ও-ইউ।'

সবাই একসঙ্গে তিনবার বললাম, 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

এভাবে শেষ হলো ক্যাম্পের আরেকটি পরীক্ষা। এরপর রুটিন মতো পিটি। লাইনে দাঁড়িয়ে ঝাড়া দেড় ঘন্টা পিটি করে সবাই ঘেমে গেলাম। পিটির পর ট্রেনিং। এবার আর পেট্রল অনুযায়ী নয়। টেন্ডারফুট ব্যাজ যাদের দেয়া হবে তাদের কয়েক গ্রুপে ভাগ করা হলো। একইভাবে সেকেণ্ডে ক্লাস ব্যাজ আর ফার্স্ট ক্লাস ব্যাজ যারা পাবে তাদেরও ভাগ করা হলো। ফার্স্ট ক্লাস ব্যাজে প্রার্থীদের ট্রেনিং-এর দায়িত্ব নিলো আরিফ আর জোসেফ। সেকেণ্ড ক্লাস আর টেন্ডারফুটের দায়িত্ব দেয়া হলো কয়েকজন পেট্রল লিডারকে। দুপুরের রান্না হবে একসঙ্গে। পাট্টিক, রঞ্জিত সামাদ আর আমাকে দেয় হলো প্রথম দিনের রান্নার দায়িত্ব। কয়েকজন টেণ্ডারফুট আমাদের সাহায্য করবে, সেই সঙ্গে ওদের শেখাও হবে।

ভাঁড়ার থেকে দেয়া হলো চাল, ডাল, আলু, ডিম, বাঁধাকপি, মটরশুটি, টমেটো পেঁয়াজ আর মশলা। আমরা ঠিক করলাম চাল ডালের খিচুড়ি করবো, সঙ্গে দেবো বাঁধাকপি, মটরশুটি, আলু। ডিমের কারি করবো গরম মশলা দিয়ে মাংসের মতো। টমেটো আর পেঁয়াজের সালাদ হবে। গত গরমের ছুটিতে দিদার কাছে থেকে রান্না শিখেছি। বাটা মশলা না পেলে কাটা মশলা দিয়ে রান্না কিভাবে ভালো করতে হয় আমার ভালোই জানা ছিলো। দেখলাম রঞ্জিত আর সামাদও কম যায় না। দুটো বড় হাঁড়িতে খিচুড়ি চড়িয়ে দিলাম। ডিমগুলো ধুয়ে খিচুড়ি হঁড়িতে পাঁচ মিনিট সেদ্ধ করে তুলে নিয়ে খোসা ছাড়িয়ে আলাদা হাড়িতে কারি বসালাম। তিন ঘন্টার মধ্যে আমাদের তিনটা আইটেম বানানো শেষ। কারিটা নামানোর আগে লবণ চাখতে গেছি ব্রাদার ফিলিপ্স এসে বললেন, 'আমি নিকোলাস স্যাররে কইয়া দিমু রান্দনের সময় তোমরা অর্ধেক খাইয়া ফালাইস।' কথাটা বলে আর দাঁড়ালেন না। মুখ টিপে হেসে চলে গেলেন।

ট্রেনিং-এর জন্য সবাই ছোট ছোট দলে ছড়িয়ে পড়েছিলো। ট্রেনিং-এর তো অন্ত নেই। সাড়ে দশটা নাগাদ সবাই ফিরে এলো। এরপর খেলা, গোসল করা, কাপড় ধোয়া, দুপুরের খাওয়া এইসব। রান্না করতে করতে দেখি মাঠের মাঝখানে গোল হয়ে বসে সবাই—'হু স্টোল দ্যা কুকিজ' খেলছে। রান্না শেষ করে আমরাও ওদের সঙ্গে যোগ দিলাম।

বারোটার সময় গোসল। কাপড় বদলে সবাই ছুটলাম পুকুরে হুটোপুটি করতে। ছোটরা যারা সাঁতার জানে না তাদের কেউ গোলো টিউবঅয়েলে, কেউ বালতিতে পানি নিয়ে ঘাটে বসে গোসল করলো। আর আমরা যারা সাঁতার জানি—আধঘন্টা ধরে সারা পুকুর দাপিয়ে বেড়ালাম। নিকোলাস স্যার ব্রাদার ফিলিপ্সকে নিয়ে বাগানবাড়িতে গেছেন গোসল করতে।

খেতে বসে টের পেলাম কী ভীষণ খিদে পেয়েছে। আগেও দেখেছি ক্যাম্পে এলে খিদে বেড়ে যায়। খেতে খেতে নিকোলাস স্যার বললেন, 'চমৎকার রান্না হয়েছে।'

ব্রাদার ফিলিপ্স বললেন, 'অগোরে দুই তিনখান কইরা বাবুর্চির ব্যাজ দিয়া দ্যান নিকোলাস স্যার।'

শওকত বললো, 'কারেকশন প্লীজ। ওটাকে বাবুর্চির ব্যাজ বলে না ব্রাদার, কুকিং ব্যাজ বলে।'

'তয় এইরকম ব্যাজ চ্যাষ্টা করলে আমিও পাইতাম পারি। আর আমাগো লিস্টারের তো দশখান পাওন উচিত।' খেতে খেতে বললেন ব্রাদার ফিলিপ্স।

শিবলী বললো, 'আপনার আর লিস্টারের বয় স্কাউট হওয়ার বয়স পেরিয়ে গেছে।'

'তমরা বড় হিংসুইটা পোলাপান। আমারে অরা এত হিংসা করে ক্যান, নিকোলাস স্যার কন তো?'

নিকোলাস স্যার মৃদু হেসে বললেন, 'গুণী মানুষকে অনেকেই হিংসা করে।'

'তমরা সবাই শুনছ তো, নিকোলাস স্যার আমারে গুণী কইছেন? তমাগ মতোন ওনার মনে কোন হিংসা নাই।'

ব্রাদার ফিলিপ্স এমনভাবে কথাগুলো বললেন—শুনে হাসতে হাসতে কেউ বিষম খেলো।

খাওয়ার পর আধ ঘন্টা বিশ্রাম। তারপর আবার ট্রেনিং—সকালের মতো ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে। টেণ্ডারফুটেরা করবে নটিং আর ট্রাকিং। নটিং মানে দড়ি দিয়ে কিভাবে নানারকমের গেরো বাঁধতে হয় আর ট্র্যাকিং-এর ট্রেনিং তো শুরু হয়েছে কাল সকাল থেকেই। সেকেণ্ডে ক্লাসের জন্য রয়েছে নটিং, ল্যাশিং, ব্রীজের জন্য ট্রেসেল তৈরি, ইস্টিমেশন, সিগনালিং আর কুকিং। ফার্স্ট ক্লাসের ট্রেনিং হচ্ছে ম্যাপ মেকিং, জার্নি টেস্ট, কুকিং, অবজার্ভেশন, ক্যাম্পের ইতিহাস লেখা, গাছ থেকে গাছে দড়ির ব্রীজ তৈরি করে পার হওয়া এইসব।

রাতের রান্না পেট্রলগুলো নিজেদের মতো আলাদাভাবে করবে। আমি শিবলীকে নিয়ে বেরুলাম অবজার্ভেশনে। আরো কয়েকটা দল বেরুলো নিজেদের মতো। নিকোলাস স্যার বললেন, 'আমাদের ক্যাম্প ফায়ারে গ্রামের লোকদের নেমন্তন্ন করবে।'

গ্রামের পথে ইউনিফর্ম পরা শিবলী আর আমাকে দেখে কয়েকজনই জিজ্ঞেস করলো, আমরা সিনেমা কোম্পানির লোক কি-না, সিনেমায় অভিনয় করছি কি-না। আমরা ওদের বললাম, আসলে আমরা কারা। রাতে ওদের ক্যাম্প ফায়ারে আসতে বললাম।

অবজার্ভেশনের জন্য চারদিক ভালোভাবে দেখতে দেখতে যাচ্ছিলাম। লক্ষ্য করলাম এদিককার ঘরগুলো বেশ দূরে দূরে। এক একটা ভিটেয় আট-দশটা ঘর, তারপর দুতিনশ গজের ভেতর কোন ঘরবাড়ি নেই। ধানকাটা হয়ে গেছে—ধু ধু প্রান্তর। শিবলীকে বললাম, 'তুই তো মৌচাকে আর জয়দেবপুরে গেছিস। এখানকার মাটির রঙ লক্ষ্য করেছিস?'

'কী?' অন্যমনস্কভাবে বললো শিবলী।

'এদিককার মাটির রঙ কালো আর জয়দেবপুরের মাটির রঙ লাল।'

'হুঁ।'

'ঘরবাড়িগুলো দেখ, অনেক দূরে দূরে।'

'হুঁ।'

'ধানক্ষেতগুলো অনেক নিচু। মৌচাক, জয়দেবপুরে কিন্তু এরকম নয়।'

'হুঁ।'

'বর্ষায় মনে হয় সব ডুবে যায়।'

'হুঁ।'

'কী হুঁ হুঁ করছিস? কথা বলছিস না কেন?'

ধমক খেয়ে শিবলী আমার মুখের দিকে তাকালো। কয়েক সেকেণ্ড তাকিয়ে থেকে বললো, 'আমি অন্য একটা কথা ভাবছিলাম।'

'কী কথা?'

'কাল রাতের সেই আলোর কথা মনে আছে? তুই যে বলেছিলি আলেয়ার আলো?'

'কেন, কী হয়েছে?'

'আমি আজি দুপুরে জঙ্গল মতো সেই জায়গায় গিয়েছিলাম। সেখানে কোনও পুরোনো জলাটলা নেই।'

'তাতে কী হলো?'

'শুকনো জমিতে আলেয়ার আলো জ্বলে না।'

শিবলীর কথা শুনে আমি চিন্তিত হলাম—'তুই কী বলতে চাইছিস?

'কাল রাতে ওটা অন্য কিছু ছিলো।'

'অন্য কী?'

'কেন শুভদারঞ্জন স্যার বলেননি অতৃপ্ত আত্মার কথা?'

'অতৃপ্ত আত্মা আলো হয়ে ঘুরে বেড়ায় এমন কথা তিনি কখনো বলেননি।'

'তাহলে তুই-ই বল ওটা কিসের আলো ছিলো?'

কথাটা ভাবতে গিয়ে হেসে ফেললাম—'হতে পারে সিনেমা কোম্পানির কারো পেট খারাপ হয়েছে, টর্চ নিয়ে বেরিয়েছিলো। এ নিয়ে এত চিন্তা করছিস কেন?'

'দুটো জলজ্যান্ত ঘোড়া এক রাতে উধাও হয়ে গেছে।'

'নিশ্চয় কেউ চুরি করেছ।'

'গোটা বাগানবাড়ি দেয়াল দিয়ে ঘেরা। সদর দরজা তালা বন্ধ ছিলো। চোর ঢুকবে কোত্থেকে? আর ঢুকলেই বা—ঘোড়া দুটো যদ্দুর জানি পক্ষিরাজ ছিলো না।'

'তুই বলতে চাস এগুলো হাওয়ায় মিলিয়ে গেছে?'

'আমি কিছু বলছি না। তোকে শুধু ভাবতে বলছি।'

হাঁটতে হাঁটতে গাছপালা ঠাসা একটা জায়গায় এলাম। প্রথমে মনে হলো ভেতরে বুঝি কারো ঘরবাড়ি আছে। এগিয়ে দেখি অতি পুরোনো একটা ভাঙা মন্দিরের মতো। দরজা জানালা কিছু নেই। পলেস্তারা খসে পড়েছে। বড় একটা অশ্বত্থ গাছ উঠেছে মন্দিরটাকে সাপের মতো পেচিয়ে। এক সময় চারপাশে চওড়া আঙিনা ছিলো। সেখানে এখন ফাটল ধরেছে। ফাঁকে ফাঁকে ছোট ছোট ঝোপঝাড়। একদিকে একটুখানি পাচিলের আভাস—বাকি সব মাটির সঙ্গে মিশে গেছে। দেখে মনে হয় বহু বছর এখানে

কেউ আসেনি।

শিবলী বললো, 'চল, কাছে গিয়ে দেখি।'

আমি ইতস্তত করলাম—'সাপ-টাপ থাকতে পারে।'

'শীতের দিনে এই রোদের ভেতর সাপ কোত্থেকে আসবে?'

সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়লেও রোদের তেজ পুরোপুরি মরেনি। শিবলীর সঙ্গে মন্দিরের চাতালে এলাম। পা, দু'পা করে মন্দিরের ভাঙা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠলাম। হঠাৎ সিঁড়ির এক ফাটলের ফাঁকে নজর পড়তেই আমার মনে হলো, এখানে লোকজন যাওয়া আসা করে। শিবলীকে বললাম, 'বাইরে থেকে মন্দির মনে হলেও আসলে কিন্তু তা নয়।'

'কী করে বুঝলি?' অবাক হয়ে জানতে চাইলো শিবলী।

'সিঁড়ির গোড়ায় একটা সিগারেটের টুকরো দেখলাম, বেশি পুরোনো নয়।'

শিবলী চিন্তিত হয়ে বললো, 'কেউ হয়তো পূজো-টুজো দিতে আসে।'

'পূজো দেয়ার চিহ্ন তো কোথাও দেখছি না?'

'তুই কী বলতে চাইছিস?'

'বলছি ভালো করে অবজার্ভ কর। আমরা অবজার্ভেশনে বেরিয়েছি।'

আমরা দু'জন দরজার ফাঁকা জায়গা দিয়ে ভেতরে ঢুকলাম। কম করে হলেও তিনশ বছরের পুরোনো মন্দির। সেই আমলের ছোট ছোট ইট আর সুরকির পুরু দেয়াল। দরজা জানালা না থাকাতে বিকেলের এক টুকরো আলো ভেতরে এসে পড়েছে। কিসের যেন বোঁটকা গন্ধ পাচ্ছিলাম। ওপরে খচমচ শব্দ হতে তাকিয়ে দেখি ছাদ ফেটে নেমে আসা অশ্বত্থ গাছের শেকড়ের গায়ে অনেকগুলো কালো কালো কি যেন ঝুলছে। হঠাৎ ডানা ঝাপটানোর শব্দ হতেই বুঝলাম ওগুলো বাদুড়। আমাদের পায়ের শব্দে ওদের ঘুমের ডিস্টার্ব হওয়াতে কয়েকটা বাদুড় ঝটপট করে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় উড়ে গেলো। ভেতরের দিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। মনে হলো আলো ছাড়া যাওয়া ঠিক হবে না।

শিবলী আমার হাত টেনে বললো, 'চল বেরোই, দুর্গন্ধে আমার বমি আসছে।'

মন্দিরের চাতালে নেমে দেখি বেশ কিছুটা দূরে ঘরের মতো কি যেন। ভাঙা ইটের স্তুপ মনে হচ্ছে। বুনো কাঁটাঝোপ গজিয়েছে চারপাশে। শিবলী বললো, 'ওদিকটায় যাবি?'

আমি মাথা নাড়লাম—'আমাদের এবার ফেরা দরকার। কাল সময় পেলে আসবো।'

ফেরার পথে রাস্তার বাঁকে সিনেমা কোম্পানির প্রোডাকশন ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা। শিবলী দেখতে পেয়ে ডাকলো, 'দাগুবাবু কোথায় যাচ্ছেন?,

একটু মকে আমাদের দিকে ফিরে তাকালো দাগুবাবু। শিবলী যদি দাগুবাবু না বলতো আমি নির্ঘাত তাকে কোন সিনেমা স্টার ভাবতাম। চমৎকার দেখতে, কালো ফুলপ্যান্ট আর কালো পুলোভার, গায়ের ফর্শা রঙের সঙ্গে চমৎকার মানিয়েছে।

শিবলীকে চিনতে পেরে হাসিমুখে এগিয়ে এলো দাগবাবু—'আরে, তুমি আফজাল সাহেবের ভাই না? এদিকে কোথায় এসেছিলে?' খসখসে গলায় কথাগুলো বলে কাছে

এসে আমাদের সঙ্গে হাত মেলালো।

শিবলী বিগলিত হয়ে বললো, 'গ্রাম দেখতে বেরিয়েছিলাম। আমাকে অবজার্ভেশন টেস্ট দিতে হবে।'

'ছোটবেলায় আমিও ক'দিন স্কাউটিং করেছিলাম।' হাসিমুখে বললো দাশুবাবু। 'আমাদের স্কাউট টিচার এত কড়া ডিসিপ্লিনের ছিলেন—দু'দিনেই বাপ বাপ করে পালিয়েছি।'

আমি বললাম 'আমাদের নিকোলাস স্যার কিন্তু চমৎকার মানুষ।'

'আরে সবাই কি আর আমাদের মুজিবুল্লা খান পাঠান স্যারের মতো হবে নাকি! তোমাদের নিকোলাস স্যারের সঙ্গে আমারও পরিচয় হয়েছে। ভারি অমায়িক মানুষ। আমাদের ডিরেক্টরের নাকি ছেলেবেলার বন্ধু।'

শিবলী বললো, 'আপনি কোথায় যাচ্ছিলেন?'

'আর বোলো না।' বিরক্ত হয়ে দাশুবাবু বললো, 'আমাদের হিরোইন একটু আগে হুকুম দিলেন রাতে তিনি মোরগ পোলাও খাবেন। পোলাওর চাল সঙ্গে এনেছিলাম বলে রক্ষা। স্টকের মুরগি গতকাল শেষ হয়েছে। ভেবেছিলাম কাল সকালে কিনবো। তা আর হলো কই! মুরগি খুঁজতে বেরিয়েছি গেরস্তর বাড়িতে। সিনেমা কোম্পানির প্রোডাকশন ম্যানেজার হওয়া যে কী ঝক্কি হাড়ে টের পাচ্ছি।'

আমি বললাম, 'আপনাকে দেরি করিয়ে দিলাম। আমরা যাই তাহলে।'

'ঠিক আছে যাও। তবে বনে বাদাড়ে সাধানে ঘোরাফেরা কোরো। তোমাদের নিকোলাস স্যারকেও বলেছি জায়গাটা সুবিধের নয়। এখানে ক্যাম্প করা ঠিক হয়নি। কখন কী অঘটন ঘটে বলা তো যায় না।'

শিবলী বললো, 'আপনারা যে স্যুটিং করতে এলেন?'

এবার রীতিমতো বিরক্ত হলো দাশুবাবু। বললো, 'আমি কি আহ্লাদ করে এসেছি? তোমার ইরফান ভাই কবে একবার এ বাড়িতে এসেছিলেন। বললেন রাজনর্তকী ছবির জন্য এ বাড়িটাই তাঁর চাই। আমি রোজ গার্ডেনের কথা বলেছিলাম। করটিয়ার জমিদার বাড়ির কথা বলেছিলাম। ওঁর এক গোঁ—না এটাই নাকি তাঁর দরকার। পারমিশন পেতে কী যে ঝামেলা হয়েছে! তার ওপর উটকো বিপদ—ভূতের ভয়! শুনেছো তো আমাদের সাইড হিরোইন হেলেন নিজ চোখে দেখেছে ওঁদের। সন্ধ্যেবেলা নাম নিতে নেই।' কথা বলতে বলতে দাশুবাবু ভয়ে শিউরে উঠলো—যেন জমিদার বাড়ির অতৃপ্ত আত্মারা তার আশেপাশে ঘুর ঘুর করছে। এরপর দু'হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে—'দুগ্‌গা, দুগ্‌গা' বলে চলে গেলো।

ক্যাম্পে ফেরার পথে শিবলী বললো, 'তুই তো আমার কথা বিশ্বাস করিসনি। শুনলি তো দাশুবাবু কী বললেন?'

'দাশুবাবু ভয় পেয়েছেন ওটাই বুঝলাম।'

'অকারণে কেউ ভয় পায় না।'

'দাশুবাবু নিজে দেখেছেন বলে তো বললেন না। ওদের সাইড হিরোইন কী দেখেছে তাই নিয়ে ভয়ে সিটিয়ে আছেন। তবে এটা ঠিক, লোক হিসেবে দাশুবাবু খুবই

ভদ্র। হাসিটা ভারি সুন্দর।'

'চেহারাটাই বা খারাপ কী!' শুধু ভয়েসের জন্য ছবিতে চান্স পেলেন না।'

ক্যাম্পে ফিরে দেখি অবজার্ভেশনে যারা বেরিয়েছিলো সবাই এসে গেছে। তাঁবুতে তাঁবুতে বিকেলের চা বানাবার তোড়জোড় চলছে। আমি আর শিবলী যে যার তাঁবুতে ঢুকলাম। ক্যাম্প ফায়ারে কী করবো এ নিয়ে এনামুলের সঙ্গে কিছুক্ষণ আলোচনা হলো।

চায়ের পর খেলার পালা। ছুটোছুটি করে রিং ছোঁড়াছুড়ি খেললাম। ছটায় আবার তাঁতে ফিরে রাতের রান্নার আয়োজন। শেখর আর শাহেদকে রান্নার ভার দিয়ে আমরা বসলাম ক্যাম্প ফায়ারের আইটেম ঠিক করতে। মুন্না আর ফারুক বললো ওরা একটা কৌতুক নকশা করবে। ওদের মহড়া দেখে এনামুল বললো, 'ঠিক আছে আজ তাহলে এটাই হোক।'

রাতের খাবার আটটার ভেতর শেষ করে আবার সেই আনন্দ উৎসবের ক্যাম্প ফায়ার। গ্রাম থেকে বেশ কিছু লোক এসেছে ক্যাম্প ফায়ার দেখতে। ট্রুপ লিডার আরিফ ক্যাম্প ফায়ার উদ্বোধন করলো। পেট্রলগুলো একে একে তাদের অনুষ্ঠান দেখলো। গ্রামের লোকেরা কখনো হাসির হুল্লোড়ে গড়িয়ে পড়লো, কখনো কান ফাটানো হাত তালি দিলো। ফার্স্ট হলো জোসেফদের জাগুয়ার পেট্রলের গ্রুপ ড্যান্স। জোসেফ এথেন্সে গিয়ে দেখে এসেছিলো কেনিয়ার ছেলেদের জংলি নাচ। ফার্স্ট হবার মতোই আইটেম ছিলো ওটা।

নিকোলাস স্যার বিজয়ীর নাম ঘোষণা করলেন। এনামুল ঘোষণা করলো ক্যাম্প ফায়ারের সমাপ্তি। গ্রামের লোকেরা অনুষ্ঠান নিয়ে গল্প করতে করতে ফিরে গেলো। আমরা সবাই তাঁবুতে এস কম্বলের নিচে ঢুকলাম। আমাদের পেট্রলের ফারুক রাতে ডিউট দেবে।

রহস্যের হাতছানি

মাঝরাতে বাইরে 'চোর চোর' চিৎকার আর হট্টগোল শুনে চমকে উঠলাম। হঠাৎ সব কিছু আবার চুপ হয়ে গেলো। উঠে দেখি সবাই জেগে গেছে। এনামুল বললো 'কী হলো, দেখা দরকার।'

আমি আর এনামুল ঝটপট পোশাক পরে বেরিয়ে এলাম। অন্যদের বললাম, 'জেগে থেকে তাঁবু পাহারা দিতে।

নিকোলাস স্যারের তাঁবুতে দেখি আলো জ্বলছে। একটা ছোটখাট জটলার মতো সেখানে। কাছে যেতেই শুনলাম যেন চাপা গলায় বললো, 'এই তো উলফ পেট্রলও এসে গেছে।'

আরিফকে সামনে পেয়ে জিজ্ঞেস করলাম 'কি হয়েছে আরিফ ভাই? হঠাৎ চোর চোর শুনলাম, তারপর সব চুপচাপ।'

মুখ টিপে হেসে আরিফ বললো, 'চোর ধরা পড়ে গেছে।'

'কোথায় চোর?'

আরিফ ভাই আঙুল তুলে তাঁবুর ভেতর ইশারা করলো।

ভেতরে দেখি কাচুমাচু হয়ে বসে আছেন ব্রাদার ফিলিপ্স। পাশে নিকোলাস স্যার হাসি চেপে জিজ্ঞেস করছেন—'বেশি লেগেছে ব্রাদার?'

'আপনের পোলারা আমার হাড্ডি ভাইঙ্গা ফালাইসে।' অভিযোগ করলেন ব্রাদার।

শওকত চাপা উত্তেজিত গলায় আমাকে বললো, 'ধরেছি আমি আর ফারুক। জাগুয়ার পেট্রলের বালতি চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন ব্রাদার। প্রথমে আমরা টের পাইনি। হঠাৎ গাছতলায় সাদা মতো কি দেখে আমি তো ভয়েই বাঁচি না। মনে হলো সুটিং কোম্পানি যে ভূতের কথা বলেছিলো ওদের কেউ নাকি। ফারুকদের ইশারা করে দেখলাম। ভয়ে কথা বলতে পারছিলাম না। দেখি আস্তে আস্তে বাগানের ঝোপের দিকে যাচ্ছে। ফারুক হঠাৎ বললো, হাতে দেখ তো, বালতির মতো কি যেন মনে হচ্ছে। তখনই খটকা লাগলো, অতৃপ্ত আত্মা বালতি দিয়ে কী করবে! দু'জন পেছন থেকে গাছের আড়াল দিয়ে পা টিপে টিপে কাছে গিয়ে চোর বলেই পিঠের ওপর বাঁশের বাড়ি মেরেছি। সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার—আমারে মাইরা ফালাইল। শুনে হাত পা ঠাণ্ডা হয়ে গেলো—আর এতো ব্রাদার ফিলিপ্স। ধরে এনে মাপটাপ চেয়ে স্যারের তাঁবুতে এনে বসিয়েছি।'

নিকোলাস স্যার তাঁবু থেকে বাইরে এসে মুখ টিপে হেসে বললেন, 'ছেলেদের এ নিয়ে কিছু বোলো না। ব্রাদার ভারি লজ্জা পেয়েছেন।' এরপর শওকত আর ফারুকের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বললেন, 'এবার কাদের ডিউটি?'

শওকত লাজুক বললো, 'প্যাট্রিক আর রইসের।'

'ঠিক আছে তোমরা তাহলে ঘুমোতে যাও।' এই বলে নিকোলাস স্যার আবার তাঁবুতে গিয়ে ঢুকলেন।

তাঁবুতে ফেরার পথে শওকত কানে কানে বললো, 'কাল তোর সঙ্গে অবজারর্ভেশনে যাবো। কথা আছে।'

পরিদিনের রুটিন মতো বিউগলের শব্দে ঘুম ভাঙলো। নাশতা সেরে পিটি করে, টেণ্ডারফুট ক'টাকে ফ্ল্যাগ আর নটিং-এর ট্রেনিং দিয়ে পুকুরে গিয়ে সাঁতার প্রতিযোগিতায় যোগ দিলাম। সাঁতারে কেউ শওকতকে হারাতে পারে না। বেশ কিছুক্ষণ দাপদাপি করে উঠে এসে দুপুরের খাওয়া সারলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর শিবলীকে নিয়ে আগের দিনের মতো অবজার্ভেশনে বেরুলাম। ট্রুপ লিডারকে বলে শওকত এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলো।

জমিদার বাড়ির সিংদরজা পেরিয়ে শওকতকে জিজ্ঞেস করলাম, 'কাল রাতে যে বলেছিলে কথা আছে?'

আমার কথার জবাব না দিয়ে শওকত বললো, 'শিবলী, তোর মনে আছে পরশু বিকেলে ইরফান ভাইর ওখানে যে গিয়েছিলাম ওদের প্রোডাকশন ম্যানেজার কী বলেছিলো?'

শিবলী বললো, 'মনে থাকবে না কেন?'

'রান্টুকে বলেছিস?'

'বলেছি।'

'আর কাকে কাকে বলেছিস?'

'আর কাউকে বলিনি। কেন, কী হয়েছে?'

'আমি স্যারকে বলেছিলাম স্যার বললেন, ছেলেদের এসব কথা না বলতে, মিছেমিছি ভয় পাবে।'

আমি বললাম, 'তুমি কী এসব গপ্পো বিশ্বাস করো শওকত ভাই?'

'তখন করিনি।' শওকত আস্তে আস্তে বললো, 'কাল রাতে যা দেখলাম মনে হচ্ছে বাড়িটায় কিছু একটা আছে।'

'কী দেখেছো?' আমি আর শিবলী প্রায় এ প্রসঙ্গে প্রশ্ন করলাম।

'তোরা আবার কাউকে বলবি না তো?'

শিবলী ব্যস্ত গলায় বললো, 'কাউকে বলবো না। বলো কী দেখেছো।'

'জমিদার বাড়ির ঝুল বারান্দায় একটা আলো হেঁটে বেড়াচ্ছে দেখলাম। ব্রাদার ফিলিপ্সকে ধরার আগে। ফারুক পেচ্ছাব করতে গিয়েছিলো। ও দেখেনি। একটু পরে দেখলাম বারান্দার আলোটা নিভে গেলো। পুব দিকের বাগানের ভেতর তেমনি একটা আলো কয়েক পা হেঁটে নিভে গেলো।'

'তারপর?' রুদ্ধশ্বাসে জানতে চাইলো শিবলী।

'পুকুরের ওপারের ঘাটে দেখলাম, সাদা কাপড়ে ঢাকা দুটো মানুষের মতো কী যেন কিছুক্ষণ ঘাটে দাঁড়ালো। তারপর বাগানের অন্ধকারের দিকে হেঁটে গেলো।'

'অন্ধকারে দেখলে কী করে?'

'তেমন ঘুটঘুটে অন্ধকার ছিলো না। আকাশে চাঁদ ছিলো।'

'আর কিছু দেখোনি?' শিবলীর গলায় ভয় মেশানো উৎকণ্ঠা।

'না। এর কিছুক্ষণ পর ব্রাদার ফিলিপ্সকে দেখে প্রথমটায় তাই ভয় পেয়েছিলাম। আমার মাথায় তখন পুকুর ঘাটের ছবিটা ভাসছিলো।'

শওকতের কথা শেষ হওয়ার পর শিবলী কিছু বলার জন্য উসখুস করছিলো। শেষে থাকতে না পেরে আমার অনুমতি চাইলো—'বলবো?'

'কী?' শওকত ভুরু কুঁচকে আমাদের দিকে তাকালো। আমি শিবলীকে বললাম, 'বল।'

শিবলী প্রথম দিন পাহারা দেয়ার সময় আলো দেখার কথা বললো। শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলো শওকত। তারপর বললো, 'তোরা এখন কোথায় যাচ্ছিস?'

আমি বললাম, 'কাল অবজার্ভেশনে বেরিয়ে একটা ভাঙা মন্দির দেখেছিলাম। আশে-পাশে কোনো লোকালয় নেই। তবু মনে হলো মন্দিরে লোকজন যাওয়া আসা করে। আজ ওটা ভালোভাবে দেখবো।'

'তোরা আলোর ব্যাপারে কিছু ভেবেছিস?'

কাষ্ঠ হেসে শিবলী বললো, 'ভাবাভাবির কী আছে? আমার তো মনে হয় শুধু জমিদার বাড়িতে নয়, গোটা গ্রামটাতে অশরীরী আত্মার ঘুরে বেড়াচ্ছে। কালও দাশু বাবু পথে সাবধান করে দিলেন। নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছো রাস্তায় লোক চলাচল খুব কম।'

শওকত মাথা নেড়ে সায় জানালো, 'তা ঠিক। আগেকার দিনের জমিদাররা সাধারণ লোকদের ওপর ভীষণ অত্যাচার করতো। কে জানে কত লোককে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে মেরেছে, নয়তো মাটিতে পুঁতে ফেলেছে। বাড়িঘরে আগুন জ্বালিয়েও মানুষদের পুড়িয়ে মারতো তারা।'

'সে কথাই তো আমি রান্টুকে বোঝাতে পারছি না। শুভদারঞ্জন স্যার বলেননি, অপঘাতে কেউ মারা গেলে তাদের আত্মা মুক্তি পায় না?'

আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে বললাম, 'আমরা যদি গোড়াতেই ধরে নিই সব কিছু অদৃশ্য আত্মার কাজ তাহলে এর ভেতর যদি কোন রহস্য থাকে সেটা অজানা থেকে যাবে।'

শওকত ভুরু কুঁচকে বললো, 'রহস্য কোথায় পেলি?'

'ইরফান ভাইদের ঘোড়া দুটো কোথায় গেলো এটা একটা রহস্যজনক ঘটনা। সিংদরজায় তালা ছিলো। দেয়াল টপকেও যাওয়া সম্ভব নয়। তাছাড়া আত্মারা নিশ্চয়ই ঘোড়ায় চড়ে ঘুরে বেড়ায় না।'

শিবলী মুখ বাঁকিয়ে বললো, 'সব সময় তুই শুধু ঠাট্টা করিস।'

'ঠাট্টা নয়।' আমি গম্ভীর হয়ে বললাম, 'অবজার্ভেশনের পরীক্ষা দিচ্ছিস তুই। সব কিছু লক্ষ্য কর ভালো করে। ঘোড়া চুরির একটা হদিস পেয়েও যেতে পারি।'

শওকত আমাকে সমর্থন করলো—'রান্টু ঠিকই বলেছে শিবলী। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে। সব কিছুর ওপর নজর রাখতে হবে। কোনো কিছু অস্বাভাবিক মনে হলে নোট করতে হবে।'

জমিদার বাড়ি থেকে কোথাও না থেমে সোজা হাঁটলে পুরোনো মন্দিরটা আধ ঘন্টার পথ। আমরা যখন এলাম সূর্য তখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়েছে। কোথাও কোনো শব্দ নেই, শুধু শুকনো পাতা মাড়িয়ে আমাদের পায়ে চলার খস খস শব্দ ছাড়া।

সাবধানে কাঁটা ঝোপ থেকে গা বাঁচিয়ে আমরা মন্দিরের বাইরের ঘরগুলোর কাছে গেলাম। দূর থেকে মনে হয়েছিলো ধসে পড়া ইটের স্তুপ বুঝি—কাছে গিয়ে দেখি এক সারিতে ছটা ঘর। দুটো একেবারে ছাদসুদ্ধো ধসে পড়েছে, দুটোর দরজা জানালা নেই কিন্তু ছাদ আছে। অবাক হয়ে দেখলাম বাকি দুটো ঘরের অবস্থা শুধু ভালোই নয়, একটা ঘর রীতিমতো তালা দিয়ে বন্ধ করা, যদিও তালাটা অনেক পুরোনো, মর্চে পড়া। অন্যটার দরজা খোলা। ভেতরটা বেশ অন্ধকার। ওটার ভেতরে ঢুকতেই স্যাঁতসেঁতে ভ্যাপসা গন্ধ নাকে ধাক্কা মারলো।

কয়েকবার বাতাসে নাক শুঁকে বললাম, 'ঘোড়ার গায়ের গন্ধ পাচ্ছি।'

শওকত পকেট থেকে দেয়াশলাই বের করে জ্বালালো। মেঝের ওপর ঘোড়ার নাদি ছাড়ানো। একটু হলেই শিবলী প্রায় পা দিয়ে ফেলেছিলো। লক্ষ্য করে দেখলাম খুব বেশি হলে দু'দিনের বাসি হবে।

বললাম, 'নিখোঁজ ঘোড়ার হদিস তাহলে পাওয়া গেলো।'

শওকত হেসে বললো, 'ঘোড়ার হদিস কোথায় পেলি? পেয়েছিস তা ঘোড়ার নাদি।'

শিবলী বললো, 'আমাদের রহস্যভেদী রান্টু এই নাদি দিয়েই নিখোঁজ ঘোড়ার রহস্য ভেদ করবে।'

'ইয়ার্কি মারছিস কেন?' হেসে শিবলীকে বললাম, 'তুই না বলেছিলি তোর জানামতে ওগুলো পক্ষিরাজ ঘোড়া ছিলো না। এখানে এসব এলো কী করে?'

শিবলী বললো, 'তুই তাহলে ধরেই নিয়েছিস এগুলো ইরফান ভাইদের ঘোড়ার নাদি। আমি শার্লক হোমসেরও কোনো গল্পে পড়িনি নাদি দেখে ঘোড়া চেনা যায়। নাল দেখে বললে না হয় বুঝতাম।'

'শুধু নাদি দেখে কেন, তার সঙ্গে মাথাও ঘামাতে হয় যে। এ গ্রামে ঘোড়া আসার কোনো কারণই থাকতে পারে না। সুটিং কোম্পানির ঘোড়া চুরি গেছে। যেখানে সাধারণত মানুষের যাওয়া-আসা নেই গ্রামের এমন একটা জায়গায় পাওয়া গেলো ঘোড়ার নাদি। হিসেব খুব সোজা। এখানে এনে ওগুলো রাখা হয়েছিলো।'

'আর খুঁজে বের করার আগেই ওগুলো পাচার করে ফেলেছে।' কথাটা শেষ করলো শিবলী।

'ঠিক ধরেছিস। অন্তত দু'দিন আগে পাচার করেছে। এখন খুঁজতে হবে পায়ের ছাপ। আমাদের দেখতে হবে ওগুলো কোথায় গেছে।' বলতে বলতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম।

শওকত বললো, 'এসব জায়গায় পায়ের ছাপ কোথায় পাচ্ছিস? শুকনো পাতার ওপর দিয়ে হেঁটে গেছে। বাতাসে পাতা উড়িয়ে নিয়ে নিশানা মুছে দিয়েছে। এতো আর মরুভূমি কি কাদামাটি নয় যে পায়ের ছাপ দেখে চোর ধরবো।'

কথাটা মিথ্যে বলেনি শওকত। মন্দিরের চাতালে আর যেদিক দিয়ে যেতে পারে বলে অনুমান করলাম কোথাও ঘোড়ার পায়ের ছাপ, নাদি কিম্বা গাছের গুঁড়িতে আটকে থাকা লোম কিছুই খুঁজে পেলাম না। গোটা মন্দির আর আশেপেশের বর্ণনা কয়েক পৃষ্ঠা ধরে দেয়া যাবে, যা কিনা ট্রুপের অন্যাদের নজরে পড়ার কথা নয়।

ফেরার পথে শিবলী বললো, 'চল, একটু ঘুরে যাই। ওদিকে যে ঘরগুলো আছে ওরা হয়তো কিছু বলতে পারে।'

গতকাল যেখানে দাগুবাবুর সঙ্গে দেখা হয়েছিলো রাস্তার সেই বাঁক থেকে একশ গজের মতো পুব দিকে একটা বড় ভিটে নজরে পড়লো। গোটা তিনেক ঘর। মাটির দেয়াল, ওপরে টিন। পুরোদস্তুর ইউনিফর্ম পরা লাঠি হাতে আমরা তিন স্কাউট সেখানে গিয়ে বাইরে থেকে ডাকলাম, 'বাড়িতে কেউ আছেন?'

দু'বার ডাকতেই ইজের পরা নিমা গায়ে সাত-আট বছরের একটা মেয়ে বেরিয়ে এলো। আমাদের দেখে হকচকিয়ে ভয় পাওয়া গলায় ডাকলো, 'অ মাসি, জলদি আহ। পুলিশ আইছে।'

ভেতর থেকে খনখনে গলায় ওর মাসি বললো, 'ক্যা, পুলিশ আইছে ক্যা? ক, কত্তা বাড়ি নাই।'

শওকত তাড়াতাড়ি মেয়েটাকে বললো, 'আমরা পুলিশ না। স্কুলে পড়ি। তোমার মাসিকে বলো, ভয় পাওয়ার কিছু নেই।'

মেয়েটা আগের মতো চেঁচিয়ে বললো, 'মাসি পুলিশগুলা কয় হ্যারা বলে ইস্কুলে পড়ে। তুমি আহ না।'

ভেতর থেকে আধময়লা থান পরা গোবর মাখা হাতে একজন মহিলা বেরিয়ে এলো। আমাদের ভালো করে দেখে বললো, 'হ, পুলিশের কাপড় পিন্দনে ইশকুলের ছাত্র মনে অয়। তোমরা ক্যাঠা, সিনিমায় পাট করতে আইছ নিহি?'

আমি বললাম, 'আমরা স্কাউট। আপনাদের সঙ্গে কথা বলতে এসেছি।'

'কি কাউট কইলা'? মহিলা ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করলো।

'স্কাউট। মানে মানুষের উপকার করি, বিপদে-আপদে সাহায্য করি। বাড়িতে পুরুষ মানুষ কেউ নেই?'

'আমাগো কোনো বিপদ অয় নাই। পুরুষ মাইনষেরা কামে গ্যাছে। হ্যগরে দিয়া কী ওইবো?'

আমি বললাম, 'আপনাদের বাড়ির উত্তর পশ্চিম দিকে একটা পুরোনো মন্দির দেখলাম। ওখানে কি পূজো টুজো হয়?'

'ওমা, কয় কি! ওইহানে পূজা দিবো ক্যাঠা? ওইডা তো আছিল শ্মশানকালীর মন্দির। আমাগো বাপ ঠাকুদ্দার আমলেও ওইহানে পূজা দিছে বইলা হুনি নাই।'

'লোকজনও কেউ যায় না মাসি?'

'ক্যাঠায় যাইবো! আমাগো ঠাকুরের জোয়ান পোলাডা একবার ঘুরতে গিয়ে কী দ্যাখল ভগমান জানে, মুহে রক্ত উইঠা মইরা গেল গা এক রাইতের মইদ্যে। না বাবারা, ওইহানে কেউ যায় না।'

শওকত কোনও কথা না বলে যেন সব বুঝে গেছে এইভাবে মাথা নাড়লো।

মাসি বললো, 'তোমরা ভিতরে গিয়া বহ না। এইহানে উঠছ কই?'

'হালুটিয়ার জমিদার বাড়িতে।' বলে কী প্রতিক্রিয়া হয় দেখার জন্য মাসির মুখের দিকে তাকালাম।

ভয় পাওয়া গলায় মাসি বললো, 'কও কী তোমরা? হেইডাও তো ভূতুইড়া বাড়ি!'

'আপনারা কেউ সেখানে ভূত দেখেছেন?'

'আমরা দেহুম কোই! মাইনষে কয়, হুনি।'

শওকত বললো, 'এবার ফেরা যাক। তিনটা কুড়ি বাজে!'

'তোমরা কি উবগার করতে চাইছিলা! আমদের দুগা নিমপাতা পাইরা দিবা?'

'নিশ্চয়ই দেবো।' আমরা খুশি হয়ে সামনের বড় নিমগাছটায় উঠে মাসিকে পাতা

পেড়ে দিলাম। মাসিও খুশি হয়ে বললো, 'তোমরা কাউটরা বড় ভালা!'

মন্দির সম্পর্কে আমরা যা ভেবেছিলাম তার কিছুটা সমর্থন পাওয়া গেলো মাসির কথায়। মন্দিরে গ্রামের সাধারণ লোকজন যায় না। আরেকটা খবর জানা গেলো, জমিদার বাড়ির ভূতের খবর গ্রামের লোকেরাও রাখে। ভারি কৌতূহল হলো—জমিদার বাড়ির ভেতরটা যদি দেখতে পেতাম!

কিছুক্ষণের মধ্যেই সুযোগ পেয়ে গেলাম। জমিদার বাড়ির সিংদরজা দিয়ে ঢুকতেই কানে এলো হুইসেলের একটা 'পিপ-পিপ' শব্দ; যার অর্থ হচ্ছে লাইনে এসে দাঁড়াও। বোঝা গেলো নিকোলাস স্যার নতুন কোনো খেলার কথা ভেবেছেন।

আমরা বেশ পা চালিয়ে এসেছিলাম। তখনো চারটা বাজেনি। তিনজন দৌড় লাগালাম তাঁবুর মাঠে। দেখি জঙ্গলে ভরা বাগানের ভেতর থেকে ছেলেদের অনেকে দৌড়ে আসছে। পেট্রল অনুযায়ী লাইনে দাঁড়িয়ে গেলাম। সামনে হুইসেল হাতে ট্রুপ লিডার, পাশে নিকোলাস স্যার। এ পাশ থেকে ওপাশ পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে সবাইকে দেখলেন তিনি। মুখে মৃদু হাসি, যেমনটি সব সময় থাকে। বললেন, 'তোমরা জানো আমাদের ক্যাম্পিং-এর বড় একটা ট্রেনিং হচ্ছে অবজার্ভেশন। টেণ্ডারফুট আর সেকেন্ড ক্লাস যারা—আশা করি এর ভেতর জেনে গেছো অবজার্ভেশন কিভাবে করতে হয়। আজ একটা খেলা হবে। আমাদের তিনদিকে যে বাগানটা দেখছো এর বয়স একশ বছরের বেশি। গত পঁচিশ-তিরিশ বছরে কোন যত্ন নেয়া হয়নি। অনেক গাছ মরে গেছে, অনেক জংলী গাছ আর ঝোপঝাড় গজিয়েছে। তোমরা এই বাগানটা ভালো করে পর্যবেক্ষণ করবে। কী কী গাছ আছে পাতাসহ নোট করবে। অনেক রকম পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছো। কী কী পাখি আছে, নাম আর বর্ণনা লিখবে। তাছাড়া আরেক ধরনের পর্যবেক্ষণ করবে। বাগানে থাকা উচিত নয় অথচ আছে এমন কোনো জিনিস দেখলে তোমরা নোট করবে, যদি আনা সম্ভব হয় সঙ্গে করে নিয়ে আসবে।' একটু থেমে হাসি মুখে আবার বললেন, 'কী, খটকা লাগছে বুঝি! ধরো একটা জামার বোতাম কুড়িয়ে পেলে, কিম্বা সিগারেট বা বিড়ির টুকরো, কাপড়ের সুতো, জুতোর পেরেক অর্থাৎ মানুষের উপস্থিতি বোঝা যায় এমন কিছু যদি নজরে পড়ে সংগ্রহ করবে। পুকুরটাকে সেন্টার করে যদি পারো নোট করবে কোন দিকে, কত দূরে জিনিসটা পেলে। মনে হয় না টেণ্ডারফুটরা এতোটা পারবে। তবু চেষ্টা করো। যে বেশি আইটেম নোট করবে সে ফার্স্ট হবে। কারো প্রশ্নে আছে?'

টেণ্ডারফুট বান্টি বললে, 'আমাদের পেট্রল লিডাররা সঙ্গে থাকবে তো?'

মৃদু হেসে নিকোলাস স্যার বললেন, 'এটা তোমাদের খেলা। পেট্রল লিডারদের সঙ্গে আমার অন্য কাজ আছে। তোমাদের ভেতর উলফ পেট্রলের রান্টু আর প্যান্থার পেট্রলের শিবলীকে আমি অন্য একটা অবজার্ভেশনের কাজ দেবো। ওরা ছাড়া বাকি সবাই খেলা শুরু করে দাও। এক ঘন্টা সময়।'

নিকোলাস স্যারের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ট্রুপ লিডার পর পর চারবার পি-ই-ইপ, পি-ই-প করে টানা হুইসেল বাজালো; যার অর্থ— ছড়িয়ে পড়ো, এগিয়ে যাও।

নতুন ধরনের খেলা পেয়ে সবাই আহ্লাদে আটখানা হয়ে ছুটলো নিজেদের তাঁবুতে নোট বই আর থলে নেয়ার জন্য। বাগানে খেলার কথা শুনে আমিও দারুণ উৎসাহ বোধ করেছিলাম। এরপর নিকোলাস স্যার আমাদের থাকতে বলায় প্রথমে একটু দমে গিয়েছিলাম, যদিও জানি মন খারাপ হতে পারে এমন কিছু তিনি কখনোই করতে দেবেন না। তবে আমাকে আর শিবলীকে তিনি আলাদা দায়িত্ব দেবেন শুনে নিজেদের বেশ গুরুত্বপূর্ণ মনে হলো।

বারোজন পেট্রল লিডার, আমরা দু'জন এ্যাসিসটেন্ট আর ট্রুপ লিডারকে নিয়ে নিকোলাস স্যার তাঁর তাঁবুর সামনে বসলেন। কোন রকম ভূমিকা না করেই বললেন, 'দুপুরে ইরফান বললো, জমিদার বাড়ি থেকে রোজ নাকি দামী জিনিসপত্র চুরি হচ্ছে। ওদের প্রোডাকশনেরও কিছু জিনিস চুরি হয়েছে। শওকত আর শিবলী নিশ্চয়ই জানো ওদের দুটো ঘোড়া চুরি হয়েছে?'

শিবলী বললো, 'রান্টুও জানে। আজ অবজার্ভেশনে গিয়ে আরো কিছু জেনেছি, আমরা।'

'কী জেনেছো?' অবাক হয়ে উত্তেজিত গলায় জানতে চাইলেন নিকোলাস স্যার। ভাঙা মন্দিরের সিঁড়ির নিচে সিগারেটের টুকরো আর পাশের পরিত্যক্ত ঘরে ঘোড়ার নাদি দেখার বিবরণ দিলাম আমি। শওকত বললো, রাতে দেখা ছায়ামূর্তির কথা।

নিকোলাস স্যার এক কথায় শুধু বললেন, 'চমৎকার।'

আমরা ভারি লজ্জা পেলাম। নিকোলাস স্যার এবার গম্ভীর হয়ে বললেন, 'ইরফানের ধারণা—আমিও সব শুনে ওর সঙ্গে একমত, এগুলো ছিচঁকে চুরি নয়। কোনো অর্গ্যানাইজড গ্যাং এটা করছে। জানো তো পুরনো নবাব বাড়ি আর জমিদার বাড়ির জিনিসপত্র আজকাল ভীষণ চড়া দামে বিক্রি হচ্ছে। বিদেশীরা কিনে বাইরে নিয়ে যাচ্ছে। কাল রাতে ইরফানদের দুটো সিংহ চুরি হয়েছে। না, আসল সিংহ নয়, প্লাস্টার অব প্যারিসের বানানো। দেখলে মনে হতে পারে বুঝি শ্বেতপাথরের। তবে আসল যে জিনিস চুরি হয়েছে সেটা হলো নাচঘরের ঝাড়বাতি। ষাটটা বাতি জ্বলানো যায়—এত বড় ঝাড়বাতি। খুবই দামী জিনিস। ইরফান ভীষণ দামে গেছে। এ বাড়িতে সুটিং-এর পারমিশনের জন্যে ওকে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছে। পুলিশে খবর দিলে ওরা প্রথমে ইউনিটের লোকদের সন্দেহ করবে। চাই কি দু'একজনকে হয়তো অযথা ধরে নিয়ে যাবে। যার সোজা মনে হচ্ছে আর স্যুটিং করা চলবে না। আবার চোর ধরতে না পারলে চুরির দায়টা ওদের ওপরই আসবে।'

এইটুকু বলে নিকোলাস স্যার থামলেন। আমাদের সবার মুখের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে বললেন, 'ইরফান আমাদের সাহায্য চেয়েছে। আমি ওকে কথা দিয়েছি আমাদের পক্ষে যতটুকু সাহায্য করা সম্ভব আমরা করবো। তবে আমি চাই না গোটা ট্রুপ এসব কথা জানুক। আমার ধারণা চোর আশে পাশেই আছে। ট্রুপের সবাই জেনে গেলে চোররা সেটা বুঝে ফেলবে। আগে থেকে আমি চোরদের সাবধান করতে চাই না। রান্টু আর শিবলী, অবজার্ভেশন ট্রেনিং নিচ্ছো—এমনভাবে গোটা জমিদার বাড়িটা দুজনে মিলে ঘুরে দেখবে। পেট্রল লিডাররা বাইরে অবজার্ভেশন গেম নিয়ে ব্যস্ত থাকবে। যাতে

বাইরের লোকের নজর তোমাদের দিকে থাকে। আমি ক্যাম্প থেকে অবজার্ভ করবো। আমাদের ছেলেরা ফিরে এলে জানতে পারবো বাগানের ভেতরে সন্দেহজনক কিছু আছে কি-না। তোমরা কাজ শুরু করে দাও। শিবলীরা আগে ইরফানের পারমিশন নিও। ওকে নিচের বারান্দায় পাবে।'

আমি আর শিবলী নিকোলাস স্যারের কথা মতো বেরিয়ে পড়লাম। দুজনই মহা উত্তেজিত। শিবলী বললো, 'রাতে যে আলো দেখা গেছে ওটা নিশ্চয়ই চোরদের কোনো সংকেত ছিলো।'

'হতে পারে।'

আমি ভাবছিলাম অন্য কথা। চোর যদি ইরফান ভাইদের ইউনিটের বাইরের কেউ হয় তাহলে ঘোড়া চুরি করলো কিভাবে? আর যদি ভেতরের কেউ হয় প্লান্টরের সিংহ চুরি করে কী করবে? ইউনিটের লোকদের তো জানার কথা ওটার দাম খুব বেশি হলে শ'খানেক টাকা হবে। আবার ইউনিটের নাকের ডগা দিয়ে বাইরে থেকে চোর এসে ঝাড়বাতি চুরি করবে এটাও তো অসম্ভব মনে হয়। সব কিছু ভারি গোলমেলে মনে হলো।

ঝুল বারান্দার নিচে ইরফান ভাই একা বসেছিলেন। শিবলী বললো, 'স্যুটিং প্যাক আপ হয়ে গেছে।'

'মানে?'

'মানে আজ আর স্যুটিং হবে না।'

ইরফান ভাই আমাদের দেখে বললেন, 'এই যে তোমরা। স্যুটিং দেখতে এসেছো বুঝি। আজ তো স্যুটিং হবে না। আমাদের নায়কের মাথা ধরেছে।'

শিবলী বললো, 'আমাদের অবজার্ভেশন টেস্ট হচ্ছে। আমরা দু'জন জমিদার বাড়ির ভেতরটা একটু দেখবো।'

ইরফান ভাই মুখ টিপে হাসলেন—'নিকোলাস তো চমৎকার বুদ্ধি বের করেছে। ঠিক আছে তোমরা ঘুরে দেখো। আমি ইউনিটের একটা ছেলেকে সঙ্গে দিচ্ছি। কয়েকটা ঘরে যাওয়া বারণ আছে। ও বলতে পারবে।' এই বলে তিনি গলা তুলে ডাকলেন, 'পিচ্চি।'

'আইতাছি।' সরু গলায় সাড়া দিয়ে আমাদের বয়সী একটা ছেলে ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো।

ইরফান ভাই বললেন, 'এরা আমার ছোট ভাই। বাড়ির ভেতরটা দেখবে। সঙ্গে যা।'

'আহেন আমার লগে।' একগাল হেসে পিচ্চি আমাদের পথ দেখিয়ে বাড়ির ভেতর নিয়ে গেলো।

একতলা থেকে দেখা শুরু করলাম আমরা। পিচ্চি বললো, 'নিচের তলায় গর ওইচে সতেরোটা আর উপরের তলায় তেরটা।'

'ওপরে ঘর কম কেন?' আমি জানতে চাইলাম।

'উপরে নাচগর আচে। ওইটা নিচের চাইর পাঁচ গরের সোমান ওইবো।'

নিচের তলায় গেস্ট রুম, ড্রইং রুম, বিলিয়ার্ড রুম, ডাইনিং রুম, এন্টিক রুম, রান্নাঘর এইসব। গেস্ট রুমগুলোতে ইরফান ভাইদের উইনিটের লোকজনরা সব রয়েছে। এন্টিক রুমটা তালা বন্ধ। ঘরগুলো বেশ পরিপাটি করে সাজানো। কোনো কোনো আসবাবের গায়ে হালকা ধূলোর প্রলেপ থাকলেও এত বছরের পুরনো জিনিসপত্র অক্ষত রাখার কৃতিত্বটা কেয়ার টেকারদের দেয়া উচিত।

নোট বইতে প্রত্যেকটা ঘরের আসবাবপত্র কোনটা কোথায় নোটের সঙ্গে ডায়গ্রামও এঁকে নিচ্ছিলো শিবলী। আমি পিচ্চিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'ওপরে ইউনিটের কেউ থাকে না?'

'না।' মাথা নাড়লো পিচ্চি। 'তয় স্যুটিং অয় উপরে। হিরো, হিরোইনদের লয়া চাইর দিন স্যুটিং ওইচে উপরে। কাইল বি ওইচিলো।'

'কাল কতক্ষণ স্যুটিং হয়েছিলো?' জানতে চাইলাম আমি।

'বিয়ানের নয়টায় সুরু ওইচে, স্যাস ওইচে রাইত নয়টায়। সাড়ে নয়টায় প্যাকাপ কইরা সবতে নিচে গেছি।'

নিচের তলায় গেস্টরুমগুলো ছাড়া অন্য সবগুলো ঘর দেখে আমরা দোতলায় উঠলাম। সিঁড়িগুলো দেখার মতো, সেগুন কাঠের, রোলিং-এ আঙুরলতার নকশা কাটা। দোতলার উঠতেই দাগুবাবুর সঙ্গে দেখা—হাতে এক গোছা চাবি, নিচে নামবে আমাদের দেখে মুহূর্তের জন্য তার কপালে ভাঁজ পড়লো—'কী ব্যাপার, তোমরা?'

বললাম, 'আজ আমাদের অবজার্ভেশন পরীক্ষা। আমাদের দুজনের দায়িত্ব হচ্ছে জমিদার বাড়ির ওপর একটা নোট লেখা।'

'তা বেশ তো!' কাষ্ঠ দাগুবাবু বললো, 'তবে দেখার মতো তেমন কিছু নেই। আজ তো সন্ধ্যেও প্রায় হয়ে এলো। আজ স্যুটিং প্যাক আপ বলে ডায়নামোও বন্ধ করে দিয়েছি। ওপরে আলোর পাবে না। তোমরা বরং কাল এসো।'

'আমরা একঝলক দেখেই চলে আসবো।'

আমার কথা শুনে দাগুবাবু কিছুটা আশ্বস্ত হলো—'দেরি করো না, জানোই তো বাড়িটার অনেক দুর্নাম। দিনে এলে ভালো করতে।' এই বলে দাগুবাবু নিচে নেমে গেলো।

সূর্য তখন প্রায় ডুবে যাওয়ার পথে। পাখিরা সব ঘরে ফিরছে পশ্চিম দিকে বড় গাছপালা না থাকতে শেষ বিকেলের কমলা রঙের রোদ টানা বারান্দা পেরিয়ে বড় হলঘরটায় এসে শুয়ে আছে। বারান্দার পাশে মস্ত লম্বা হলঘর। মেঝে পুরু সেগুন কাঠের। পিচ্চি বললো, 'এইটা ওইচে নাচের গর। ওই দিকের গরে যাইবার পারবেন না। তালা দিয়া রাখছে। আমাগোরে খালি দুইটা গর দিচে স্যুটিং করবার লাইগা। হেই দুইটাও দাগুবাবু তালা দিয়া দিচে।' একটু থেমে পিচ্চি আবার বললো, 'এই নাচের গরের জাড়বাত্তিটা ক্যাঠায় জানি চুরি কইরা লয়া গেছে। কি সোন্দর বাত্তি আচিলো। আমরা একদিন জ্বালাইছিলাম।'

ছাদ বেশ উঁচুতে। ঝাড়বাতি খুলতে হলে মই দিয়ে উঠতে হবে। পিচ্চিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমাদের ইউনিটের কি মই আছে?'

'মই কারে কয়?' অবাক হয়ে জানেত চাইলো পিচ্চি।

'মই মানে সিঁড়ির মতো, বাঁশ নয় তো কাঠ দিয়ে বানায়, বেয়ে ওপরে ওঠা যায়।'

'অ বুজচি, চঙ্গ! আপনে চঙ্গের কতা জিগাইতাচেন? চঙ্গ থাকবো না ক্যান? দুইখান চঙ্গ আচে আমাগো। লাইট-উইট ফিট করন লাগে ত!'

শিবলী বললো, 'একবার ছাদে উঠলে হয় না?'

পিচ্চি বললো, 'লন, যাই।'

পিচ্চিকে অনুসরণ করে আমরা ছাদে উঠলাম। মস্ত বড় ছাদ। ফুটবল খেলার মাঠের মতো। চারপাশে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেলাম। মাত্র সিকি মাইল দক্ষিণে বুড়িগঙ্গা নদী। আমাদের তাঁবুর দক্ষিণের গাছপালা নদীর তীর পর্যন্ত ছড়ানো। আমি পুবদিকে মন্দিরটা দেখার চেষ্টা করলাম। গাছপালার জন্য দেখা গেলো না। ওপর থেকে আমাদের তাঁবুগুলো ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিলো।

অবজার্ভেশন করে শেষে ছেলেরা আসতে শুরু করেছে। আরিফকে নিয়ে নিকোলাস স্যার মাঠে বসে আছেন। সূর্য আরো নেমে গেছে। নিচে গাছের তলায় ছায়া ছায়া অন্ধকার।

হঠাৎ হু হু করে এক ঝলক দমকা বাতাস উঠে এলো নদীর থেকে। গাঁয়ে কাঁপন ধরিয়ে বসে গেলো। চিলেকোঠার দরজার কপাট দুটো জোরে বাড়ি খেলো। পিচ্চি বললো, 'সাইজার কারে এ সব জায়গায় থাকন ঠিক না। হুনচেন ত দাগুবাবু কী কইছে?'

মাথা নেড়ে সায় জানিয়ে শিবলীকে বললাম, 'চল ফিরে যাই।'

'এক মিনিট।' বলে শিবলী ছাদ দেখে পুরো বাড়িটার একটা নক্সা এঁকে ফেললো দ্রুত হাতে।

আমি বললাম 'চারপাশের পাচিল, দক্ষিণের নদী আর পূব দিকের মন্দিরটা ম্যাপে দেখাতে হবে। ভালো করে মনে গেঁথে নাও।'

আরেক বার চারদিকে চোখ বুলিয়ে আমরা নিচে নেমে এলাম। পিচ্চি চিলেকোঠার দরজা বন্ধ করতেই সব অন্ধকার হয়ে গেলো। পকেট থেকে ও দিয়াশলাই বের করে জ্বালালো। বললো, 'নামবার পারবেন ত ঠিক মতন, না ধরণ লাগবো?'

শিবলী বললো, 'লাগবে না। তুমি আগে নামো।'

পর পর কয়েকটা কাঠি জ্বেলে পিচ্চি আগে নামলো। আমরা কোনও কথা না বলে ওকে অনুসরণ করলাম। সারা বাড়ি তখন থম থম করছে,—কোথাও এতটুকু আলো বা শব্দ নেই। শেষ কয়েক ধাপ নামার বাকি হঠাৎ দেখি সাঁৎ করে সাদা মতো কি যেন একটা সিঁড়ির নিচের কামরা থেকে ভেতরের দিকে গেলো। পিচ্চি সিঁড়ি দেখে দেখে পা ফেলছিলো বলে দেখতে পায়নি। তবে শিবলী আমার হাত চেপে ধরে মুখের দিকে তাকালো। ওর দু চোখে প্রশ্ন। বুঝলাম আমার মতো জিনিসটা শিবলীও দেখতে পেয়েছে। এক ঝলক দেখাতেই মনে হলো সাদা কাপড়ে মোড় একটা মানুষ, যেন কাফন পরানো লাশ।

পিচ্চি যখন শেষ সিঁড়িতে পা রাখলো— বললাম, 'এদিকের ঘরটা একটু দেখবো। তুমি দেয়াশলাইর আলোটা এদিকে ধরো।'

পিচ্চি অবাক হয়ে বললো, 'ওইদিকে তো মালখানা, তালাবন্ধ, গরে যাইবার পারবেন না।' শিবলীর গলার জোর ছিলো। পিচ্চি কথা না বাড়িয়ে সেদিকে আলো ধরলো। সরু একা প্যাসেজের মতো চলে গেছে মালখানা অর্থাৎ এন্টিক রুমের দিকে। প্যাসেজের দুপাশে দুটো ঘর, দুটোতেই তালা দেয়া। হঠাৎ ধুপ করে মাটিতে তাল পড়ার মতো একটা শব্দ হতেই কোত্থেকে একটা কালো বেড়াল 'ক্যাঁ—ও—' বলে আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে গেলো।

পিচ্চি কাঁদো কাঁদো গলায় বললো, 'আমি আর যাইবার পারুম না। আপনেরা ফিরা চলেন।'

শিবলী বললো, 'ওখানে কিসের যেন শব্দ শুনলাম!'

পিচ্চি একটা কাঠি জ্বালিয়ে বললো, 'রাইতের কালে ওইরকম বহুত আওয়াজ আমরা বি হুনচি, আপনেরা চলেন, আমার ডর—'

পিচ্চির কথা শেষ না হতেই দোতলায় একটা শব্দ হলো। মনে হলো কেউ ভারি কোন জিনিস টানছে। পিচ্চি ভয় পেয়ে পিছিয়ে এসে আমার হাত ধরলো।

ওকে নিয়ে আর এগুনো যাবে না দেখে আমরা ওর পেছন পেছন ঝুল বারান্দার নিচে এলাম। বাইরে তখনো গোধূলির আলো। ইরফান ভাইর কাছে আমাদের রেখে পিচ্চি চলে গেলো।

'কী, সব দেখা হলো?' জানতে চাইলেন ইরফান ভাই।

শিবলী বললো, 'সিঁড়ির কামরার পাশে কিসের যেন শব্দ শুনলাম। পিচ্চিকে বললাম, ওদিকেটা দেখবো, ও রাজি হলো না।'

ইরফান ভাই কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'এ বাড়িতে অদ্ভুত সব শব্দ ইউনিটের সবাই শুনেছে। আমিও শুনেছি। কখনো ঘুঙুরের শব্দ, কখনো কান্নার শব্দ, কখনো দোতলায় কাঠের মেঝেতে হাঁটার শব্দ—গিয়ে দেখেছি, কেউ কোথাও নেই। আমরা ছাড়াও এখানে এমন কেউ আছে যাদের চোখে দেখা যায় না।'

আমি একটু দমে গিয়ে বললাম, 'আপনিও কি বিশ্বাস করেন এ বাড়িতে জমিদারদের অতৃপ্ত আত্মারা ঘুরে বেড়াচ্ছে?'

'আগে করতাম না। প্রথম প্রথম ইউনিটের লোকেরা যখন বলেছে তখনও করিনি। পরে নিজের কানে শুনেছি। সাদা ছায়ামূর্তি হেঁটে গিয়ে বাতাসে মিলিয়ে যেতে দেখেছি। অনেক টাকার ক্ষতি হবে বলে এখনো সুটিং চালিয়ে যাচ্ছি। নইলে অনেক আগেই চলে যেতাম।'

আমি বললাম, 'খারাপ লোকেরা ভয় দেখাবার জন্যেও তো এসব করতে পারে।'

'নিকোলাস তাই বলেছিলো বটে। আমি যদ্দুর বুঝেছি চুরির সঙ্গে এসবের কোনো সম্পর্ক নেই। চুরি তো আমরা থাকতেও হচ্ছে। বরং চোরদের সুবিধে হয়েছে চুরির দায় আমাদের ওপর পড়বে বলে। আমাদের তাড়িয়ে চোরদের কী লাভ বলো! আমরা তো জমিদার বাড়ির জিনিস পাহারা দিতে আসিনি। খারাপ লাগছে ঘোড়া দুটোর জন্য। পাই

পাই করে ক্ষতিপূরণ আদায় করবে ঘোড়াওয়ালা।'

শিবলী বললো, 'সন্ধ্যে হয়ে গেছে, আমরা এখন যাই ইরফান ভাই।'

তাঁবুতে ফেরার পথে ইরফান ভাইর কথাগুলো ভাবছিলাম। তাঁর কথায় যুক্তি আছে। চোররা কেন তাদের ভয় দেখাতে যাবে, যখন স্যুটিং কোম্পানি থাকাতে ওদের চুরির সুবিধে হচ্ছে? তবে কি শুভদারঞ্জন স্যারের কথাই সত্যি? বিশাল নির্জন জমিদার বাড়িটাকে দেখে মনে হয় হতেও পারে। কে না জানে আগেকার দিনের জমিদাররা কী রকম পাজি আর অত্যাচারী হতো! কত মানুষের অভিশাপ পড়েছে ওদের ওপর। ওদের আত্মা কি এত সহজে মুক্তি পাবে?

মধ্যরাতের নাটক

নিকোলাস স্যারের তাঁবুর কাছে যেতেই বেশ হইচই কানে এলো। বান্টি আর রনির গলা শোনা যাচ্ছিলো বেশি। রনির কি কথার জবাবে বান্টিকে বলতে শুনলাম, 'বারে, সিগারেটের টুকরোটা তো আমিই প্রথম দেখলাম। তুই কুড়িয়ে নিয়ে ব্যাগে ঢোকালি। ওটার জন্যে তো আমি পয়েন্ট পাবো।'

'ঠিক আছে, এর জন্যে দুজনেই পয়েন্ট পাবে।' এই বলে নিকোলাস স্যার আমাদের দিকে তাকালেন। মুখ টিপে হেসে বললেন, 'তোমরা দুজন তোমাদের অবজার্ভেশন রিপোর্ট নিয়ে ক্যাম্প ফায়ারের শেষে আমার সঙ্গে বসবে।'

ক্যাম্প ফায়ারে আমাদের আইটেম কী হবে আমাকে না পেয়ে এনামুল আগেই ঠিক করে ফেলেছে। তাঁবুতে গিয়ে দেখি গানের মহড়া হচ্ছে। আমাকে দেখে লাজুক হেসে এনামুল বললো, 'আজ আমরা দুটো গান গাইবো। একটা নিকোলাস স্যারের, একটা আমার।'

'তুমি আবার কবে গান কম্পোজ করলে এনামুল ভাই?' অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম আমি।

'করেছি। কেমন হয়েছে তাই বলো। সবাই শুরু করো।'

কোরাসে সবাই গাইলে, 'মোদের এই তাঁবুর জীবন ভাইরে কতই না মজার।' সুরটা নেয়া হয়েছে 'আমার নাম দয়াল বাইদা' থেকে। শুনতে বেশ মজা লাগলো। স্কাউটিং-এর ওপর নিকোলাস স্যার বেশ কিছু গান লিখেছেন। অন্য স্কুলের স্কাউটদের দেখেছি জাম্বুরিতে গিয়ে তাঁর লেখা গান গাইতে। কতদিন আমাদের এসে বলেছে

নিকোদার নতুন গানটা লিখে দেবে? সেদিন আমরা গাইলাম ওঁর 'ক্যাম্প ফায়ারে মোরা মিলি একসাথে'—গানটা।

ক্যাম্প ফায়ারে আমাদের গান জমেছিলো এতে কোনও সন্দেহ নেই। এনামুলের গানের সুর গ্রামের লোকদের পরিচিত হওয়াতে ওরা খুব জমা পেলো। তবে জানা কথা নিকোলাস স্যারের গান গেয়েছি বলে তিনি আমাদের কখনোই ফার্স্ট প্রাইজ দেবেন না। ক্যাম্প ফায়ারের শেষে ব্রাদার ফিলিপ্স পর্যন্ত বললেন, 'তমাগো গান আমার বেশি পসন্দ ওইসে। জোসেফরা কী শক্ত গান গাইয়া ফার্স্ট ওইলো—আমি বুঝতে পারলাম না।'

আমি হেসে ব্রাদারকে ধন্যবাদ দিলাম। জোসেফরা গেয়েছিলো 'দুর্গম গিরি।' সঙ্গে গ্রুপ ড্যান্সও ছিলো।

ক্যাম্প ফায়ার শেষ করে ব্রাদার ফিলিপ্স স্কুলে চলে গেলেন তাঁর হোণ্ডায় করে। পরদিন সকালে নাকি জরুরি কাজ আছে। বলে গেলেন একবারে গ্র্যান্ড ক্যাম্প ফায়ারে আসবেন। ছেলেরা সবাই তাঁবুতে ফিরে যখন ঘুমোবার আয়োজনে ব্যস্ত—এনামুল এসে বললো, 'রান্টু, তোমাকে নিকোলাস ডাকছেন।'

এই ডাকের অপেক্ষাতেই ছিলাম। স্যারের তাঁবুতে গিয়ে দেখি সেখানে শিবলী, জোসেফ আর আরিফ বসে। আমি শিবলীর পাশে গিয়ে বসলাম। স্যার বললেন, 'রান্টু, তোমার অবজার্ভেশন রিপোর্ট শুরু করো। কিছু মিস করলে শিবলী ধরিয়ে দিও।'

ইরফান ভাইর সঙ্গে দেখা করে পিচ্চির সঙ্গে জমিদার বাড়িতে ঢোকার পর থেকে যা যা দেখেছি একের পর এক সব বললাম। দোতলার সিঁড়িতে আমাদের দেখে দাগুবাবুর কপালে যে কয়েক সেকেন্ডের জন্য ভাঁজ পড়েছিলো সে কথাও বললাম। পিচ্চির সঙ্গে কী কী কথা হয়েছে তাও বললাম। শেষ করলাম ইরফান ভাইর কথা দিয়ে।'

আমার কথা শুনে নিকোলাস স্যারের মুখের হাসি মিলিয়ে গেলো। কিছুক্ষণ কী যেন ভাবলেন। তারপর আপন মনে বললেন, 'ইরফানও তাহলে মনে করে জমিদার বাড়িতে ভূত আছে!'

শিবলী ঢোক গিলে বললো, 'মনে করার কারণও আছে।'

নিকোলাস স্যার শিবলীর আঁকা নকশাগুলো ভালো করে দেখলেন। সিঁড়ির ঘরে গুণ চিহ্ন দিলেন। কপালে ভাঁজ পড়লো তাঁর।

শেষ ডিসেম্বরের সেই রাতে হালুটিয়ার জমিদার বাড়ির মাঠে নিকোলাস স্যারের তাঁবুর ভেতর মিটমিটে একটা হারিকেনের চারপাশে আমরা ক'জন বসে। স্যারের ছেলেরা সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। চারপাশের বাগানের একশ বছরের পুরানো গাছগুলো কাঁপিয়ে নদী থেকে উঠে আসা ঠাণ্ডা বাতাস বয়ে যাচ্ছে। বাতাসের হা হা শব্দ ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। আমরা কেউ জানি না জমিদার বাড়ির ভেতর কী ভয়ঙ্কর সব ঘটনা ঘটে যাচ্ছে, কিংবা কারা ঘটাচ্ছে এইসব।

নিকোলাস স্যার বললেন, 'ভূতের কথা এখন থাক। গত ক'দিন ধরে জমিদার বাড়িতে যে চুরি হচ্ছে সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করতে পারি। আমাদের ছেলেরা আজ বাগানে অবজার্ভেশনে গিয়ে সেখানে মানুষের উপস্থিতির প্রমাণ পেয়েছে। যা যা

বলেছিলাম সবই পেয়েছে ওরা। বিড়ি আর সিগারেটের টুকরো, গাছের পাতায় পানের পিকের দাগ, ছেঁড়া বোতাম, একখানা ছেঁড়া রুমাল—কোনও কিছু বাদ নেই। অথচ কেয়ারটেকার জবেদ মুন্সী আমাকে বলেছে ঘরদোর সামলে রাখতে গিয়েই ওরা নাকি হিমসিম খাচ্ছে, বাগানের ধারে কাছে যাবার সময় নেই ওদের। তার মানে ওরা জানে না বাগানে যে লোকজন ঘোরফেরা করে, কিংবা ওদের সেটা জানা থাকলেও বাইরে কারো কাছে প্রকাশ করতে চায় না।'

আমি বললাম 'আপনি কি কেয়ারটেকারকে সন্দেহ করছেন'?

'সন্দেহ করার মতো আর কাউকে পাচ্ছি কোথায়? আজ দুপুরে কেয়ারটেকার এসেছিলো ঝাড়াবাতি চুরি যাওয়ার খবর শুনে। আমি যখন পুলিশে খবর দিতে বললাম, ও বললো, পুলিশ এলে সবার আগে স্যুটিং কোম্পানিকে ধরবে। তখন আমিই বলিলাম ঠিক আছে আমরা নিজে আগে খুঁজে দেখি। না পেলে পুলিশে খবর দেয়া যাবে। এ কথা শুনেই ইরফানের চেয়ে বেশি খুশি হল মুন্সী। ও বললো, দাশুবাবু লোকটা নাকি সুবিধের নয়। ওর ওপর নজর রাখা দরকার।'

আমি বললাম, 'ভূতের ব্যাপারে কেয়ারটেকার কী বলে?'

নিকোলাস স্যার মৃদু হেসে বললেন, 'এ ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। ও বার বার ইরফানের সাহসের প্রশংসা করছিলো। বলল, লাখ টাকা দিলেও নাকি রাতে এ বাড়িতে থাকবে না। আমি অবশ্য বলেছি, কার দায় পড়েছে আপনাকে লাখ টাকা দিয়ে এ বাড়িতে রাখবে। রান্টু, এ প্রশ্ন কেন করলে?'

'দাশুবাবুকে সন্দেহ করার কারণ এটা হতে পারে—তিনি সব সময় আগ বাড়িয়ে সবাইকে ভূতের গল্প শোনাচ্ছেন। যাতে এ বাড়ির ধারে কাছে কেউ না আসে। কাউকে সন্দেহজনক ভাবে চলাফেরা করতে দেখলে সবাই যেন ভূত টুত কিছু ভাবে।'

আমার কথা শেষ হতেই শিবলী বললো, 'সন্দেহ করার আরো কারণ আছে। প্রোডাকশন ম্যানেজারদের সঙ্গে সিনেমার জিনিসপত্র যারা সাপ্লাই দেয় তাদের খাতির বেশি থাকে। মেজদার প্রোডাকশন ম্যানেজার একবার স্যুটিং-এর জন্য আমাদের বাড়ি থেকে গ্র্যাণ্ড ফাদার ক্লাকটা নিয়ে পরে বিক্রি করে দিয়েছে। যাকে বিক্রি করেছে সে দু'বছর পর মেজদার এক ডিরেক্টার বন্ধুকে ওটা ভাড়া দিতে গিয়ে ধরা পড়েছে। ভেতর থেকে ঘোড়া পাচার করা দাশুবাবুর জন্য খুবই সোজা কাজ। রাতে কেউ দেখলেও ভূতের ভয়ে কাছে আসবে না। ঘোড়া তো যাকে তাকে বিক্রি করা যায় না। যারা সাপ্লাই দেয় তাদের কেউ হয়তো কিনেছে—যদি এর মধ্যে সেগুলো বিক্রি হয়ে থাকে।'

নিকোলাস স্যার মাথা নেড়ে সায় জানালেন—'চমৎকার বলেছো। তবে একটা খটকা এখানেও আছে। কমদামী প্লাস্টারের সিংহ দুটো দাশুবাবু কেন চুরি করতে যাবে। বেচতে গেলে ও দুটোর জন্য পঞ্চাশ টাকাও পাওয়া যাবে না।'

আমি বললাম, 'এটা আমার কাছেও খটকা লেগেছে। ও দুটো যে চুরি করেছে সে নিশ্চয়ই জানে না ওগুলো এত কমদামী জিনিস। চোর হয়তো ভেবেছে ওগুলো দামী পাথরের হবে, এ ধরনের জমিদার বাড়িতে যেমনটা দেখা যায়।'

'তার মানে তুমি বলতে চাইছো চোর বাইরের কেউ?'

'আমার তাই মনে হয়। আর তাদের আখড়া মনে হয় ভাঙা মন্দিরের পাশের ঘরে।'

জোসেফ এতক্ষণ চুপচাপ আমাদের কথা শুনছিলো। বললো, 'আজ রাতে আমরা এক কাজ করতে পারি। খুব সাবধানে জমিদার বাড়ির ভেতরটা দেখতে পারি। বিশেষ করে ওরা যখন রাতে বেরোয় তখন রাতেই ওদের সঙ্গে বোঝাপড়া করা দরকার।'

জোসেফের কথা শুনে শিবলী ভয়ে সকলের অগোচরে আমার হাত চেপে ধরলো। নিকোলাস স্যার উৎসাহিত হয়ে বললেন, 'চমৎকার বলেছো জো। আরিফ কী বলো?'

আরিফ একটু আমতা আমতা করে বললো, 'রাতে এভাবে যাওয়াটা কি উচিৎ হবে? স্যুটিং কোম্পানির কেউ হয়তো ভাবতে পারে আমরা খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে গেছি।'

শিবলী বললো, 'কাল দিনে গেলে হয় না স্যার, যেভাবে আজ গিয়েছি? দিনে ওরা স্যুটিং নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, তখন ঘুরে ফিরে দেখারও সুবিধে হবে।'

নিকোলাস স্যার বললেন, 'আমার মনে হয় রাতেই যাওয়া উচিত। কারণ এ সময় কেউ আমাদের জমিদার বাড়িতে আশা করবে না। আমি ইরফানকে বলেই ঢুকবো। এতে হবে তো আরিফ?

আরিফ কাষ্ঠ হেসে বললো, 'বলে নিলে যেতে অসুবিধে কী!'

নিকোলাস স্যার বললেন, 'ভেতরে ঢুকবো আমি, রান্টু আর শিবলী। তোমরা দুজন বাইরে একটা আড়ালে বসে বসে ওয়াচ করবে। সন্দেহজনক বা বিপদজনক কিছু দেখলেই হুইসেলে ডেঞ্জার সিগন্যাল দেবে। আমাদের গার্ডদেরও বলে যাবো এ্যালার্ট থাকতে। ভয়ের কিছু নেই শিবলী।'

শিবলী ঢোক গিলে, 'না ভয় কিসের!'

সত্যি কথা বলতে কি প্রথমে আমিও ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। পরে নিকোলাস স্যার যখন বললেন তিনি আমাদের সঙ্গে থাকবেন তখন ভয়টয় সব কর্পূরের মতো উবে গোলো। মায়া হলো আরিফের কথা ভেবে। ভেতরে যেতে হবে না শুনে আরিফকেও খুশি মনে হলো।

তাঁবু থেকে বেরিয়ে দেখি ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে সারা মাঠ আর পুকুর। যদিও জমিদার বাড়ির ওপর আধখান হলদেটে চাঁদ আকাশে ঝুলছিলো, তাতে খুব একটা আলো ছিলো না।

আরিফ আর জোসেফকে দুটো থুজা ঝাউ গাছের পাশে বসিয়ে রেখে আমরা তিনজন জমিদার বাড়ির ঝুল বারান্দার থামের পাথে দাঁড়ালাম। কম পাওয়ারের একটা বাল্ব জ্বলতে দেখেছিলাম। প্রথম দিন, আজ সেটাও নেই। না থাকাতে আমাদের জন্য ভালোই হয়েছে। অন্ধকারে গা মিশিয়ে নিকোলাস স্যার ইরফান ভাইর জানালায় টোকা দিয়ে ওঁকে জাগালেন। চাপা গলায় বললেন, দরজা খুলে দিয়ে শুয়ে পড়তে।

নিঃশব্দে ড্রইংরুমের দরজা খুলে দিয়ে ইরফান ভাই নিজের ঘরে চলে গেলেন। নিকোলাস স্যার একটা পেন্সিল টর্চ এনেছিলেন। খুব সামান্য আলো হয় ওতে। একবার জ্বালিয়ে ঘরের জিনিসপত্রের অবস্থান আর দরজাগুলো দেখে নিয়ে ওটা নিভিয়ে ফেলেন। ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'সিঁড়ির ঘরে চলো।'

পায়ের আঙুলের ওপর ভর দিয়ে বেড়ালের মতো নিঃশব্দে হেঁটে আমরা সিঁড়ির ঘরে এলাম। কয়েক সেকেন্ডের জন্য টর্চ জ্বলিয়ে নিকোলাস স্যার সব দেখে নিলেন। আবার ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'চলো, ওপরটা আগে দেখে আসি।'

আগের মতো পা টিপে টিপে আমরা ছাদে এলাম। ছাদের ওপরটা মায়াময় চাঁদের আলো। ফুটফুটে জোৎস্না না হলেও জিনিষপত্র দেখা যায়। নিকোলাস স্যার বললেন, 'চমৎকার জায়গা তো!'

স্যারকে পুব দিকে আঙুল তুলে দেখালাম—'মন্দিরটা এখান থেকে মাইল খানেক দূরে হবে।'

হঠাৎ মনে হলো সিঁড়িতে পায়ের শব্দ। আমরা প্রমাদ গুণলাম। এত বড় ছাদে আড়াল হওয়ার কোনো জায়গা নেই। চাপা গলায় নিকোলাস স্যার বললেন, 'একেবারে রেলিং ঘেঁসে মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো।'

আমরা মুহূর্তের ভেতর তাই করলাম। উপুড় হয়ে শুয়ে আমি চোখের কোণ দিয়ে দেখলাম সাদা কাপড়ে পা থেকে মাথা পর্যন্ত ঢাকা একটা লোক হারিকেন হাতে ওপরে উঠে এসেছে। একটু পরে দেখি—কি বিপদ, লোকটা যে আমাদের দিকে আসছে। কিছুটা এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়ালো লোকটা। ওর মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। শুধু দেখলাম দু'পা এগিয়ে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে কয়েক মুহূর্তের জন্য তারপর দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে গেলো।

আমরা তিনজন ঝটপট উঠে পড়লাম। নিকোলাস স্যার বললেন, 'এখানে থাকা ঠিক হবে না। লোকটা নিশ্চয়ই এবার দলবল নিয়ে আসবে। চলো ওকে ফলো করি।'

লোকটার তখন পেছন আমরাও দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নিচে নেমে এলাম। নামার সময় কাঠের সিঁড়িতে লোকটার পায়ের শব্দে হচ্ছিলো। তবে আমাদের সবার শব্দ না করে হাঁটার প্র্যাকটিস থাকাতে সামনে নেমে যাওয়া লোকটা কিছুই টের পেলো না। পেছন থেকে আমরা দেখলাম, হারিকেন হাতে লোকটা এন্টিক রুমের দিকে গেলো।

আমি ভেবেছিলাম নিচে নেমে নিকোলাস স্যার বুঝি লোকটার পেছনে যাবেন। কিন্তু না, তিনি আমাদের দু'জনকে দু'হাতে ধরে সিঁড়ির নিচের কোণটাতে ঢুকলেন। বাইরে থেকে কেউ উঁকি না মারলে বুঝতে পারবে না আমরা যে এখানে আছি। কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'লোকটা এখনই দলবল নিয়ে ওপরে যাবে।'

দু'মিনিটের মধ্যে নিকোলাস স্যারের কথা অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেলো। চার পাঁচজন লোক হন্তদন্ত হয়ে সিড়ি বেয়ে উপরে উঠে গেলো। সামনের লোকটার হাতে হারিকেন ছিলো। হারিকেনের আবছা আলোত আমরা অবাক হয়ে দেখলাম, ওদের তিনজনের পরনে পা পর্যন্ত ঢাকা সাদা আলখাল্লা, মুখে সাদা কঙ্কালের মুখোশ। দূর থেকে দেখে কেউ জ্যান্ত কঙ্কাল বলে ভুল করবে। আমরা তিনজন দেয়ালের সঙ্গে পিঠ ঠেকিয়ে নিঃশ্বাস একরম বন্ধ করে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলাম। বাইরে আরিফ বা জোসেফ কল্পনাও করতে পারবে না আমাদের চোখের সামনে কী ঘটছে।

পাঁচ মিনিট পর আবার সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনলাম। বুঝলাম লোকগুলো নেমে আসছে। হারিকেনওয়ালার পেছন পেছন লোকগুলো নেমে যেদিক থেকে এসেছিলো

সেদিকেই চলে গেলো। মৃদু ঘর্ঘর শব্দ হলো দু সেকেন্ডের মতো, তারপর সব কিছু আগের মতো নিঃশব্দ।

আমাদের হাত ধরে সিঁড়ির তলা থেকে এলেন নিকোলাস স্যার। এবার তিনি লোকগুলোকে অনুসরণ করতে বেরোলেন। কিন্তু কী আশ্চার্য, করিডোরে পা রেখে কোথাও ওদের দেখা পেলাম না। যেন মুহূর্তের ভেতর কর্পূর হয়ে উবে গেছে। অন্ধকারে আমাদের কারো মুখ দেখা না গেলেও বুঝলাম প্রত্যেকই আমরা হতভম্ব হয়ে গেছি। কয়েক মুহূর্ত কি করবো বুঝতে না পেরে দাঁড়িয়ে রইলাম পাথরের মূর্তির মতো। তারপর নিকোলাস স্যার যখন হাত ধরে সামনে টানলেন তখন এগিয়ে গেলাম এন্টিক রুমটার দিকে। বিকেলেও দেখে গেছি এন্টিক রুমে প্রমাণ সাইজের তালা ঝুলছে। করিডোরের শেষ মাথায় এসে নিকোলাস স্যার এক সেকেন্ডের জন্য পেন্সিল টর্চটা জ্বালালেন। করিডোর এখানেই শেষ। এন্টিক রুমের দরজায় আগের মতো তালা দেয়া।

দু'পাশের ঘর দুটোর দরজায় টর্চের আলো ফেলা হলো। সেখানেও তালা ঝুলছে। মনে হলো কয়েক মাস এতে কেউ হাত লাগায়নি। কিন্তু গেলো কোথায় লোকগুলো। মাথা ঘামিয়ে প্রশ্নের হদিস যখন খুঁজে পেলাম না, তখন আবার সেই লোকগুলোই তাদের সন্ধান জানিয়ে দিলো।

চমকে উঠে শুনলাম এন্টিক রুমে মানুষের চাপা কণ্ঠস্বর। কাছে গিয়ে দরজার গায়ে খুব সাবধানে কান পাতলাম। উত্তেজিত একটা কণ্ঠ মেয়েলি গলায় বললো, 'মাইরি, তোর মতো ভীতুর ডিমকে নিয়ে কাজ করতে হলে আমাদের লাল বাতি জ্বালতে হবে ফেকু।'

'বারে, আমি নিজের চোখে পষ্ট দেখলাম ছাদের কিনারে তিনটা লাশ পড়ে আছে।'

তৃতীয় কণ্ঠ বললো, 'দ্যাখ ফেকু, আমাদের মুর্গা বানাস নে। লাশের নিশ্চয়ই পাখা গজায়নি—তুই নিচে নামার সঙ্গে সঙ্গে ওগুলো উড়ে পালাবে।'

আমতা আমতা করে ফেকু বললো, 'বারে, ওগুলো যদি জমিদার বাড়ির তেনারা হন—হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে কতক্ষণ!'

প্রথম কণ্ঠ টিটকিরি মেরে বললে, 'বেশ বলেছিস! লোকে আমাদের দেখে ওই সব ভাবে আর আমরা তেনাদের ভয়ে সিটিয়ে আছি। কেন যে তেনারা এখনো তোর ঘাড় মটকায়নি তাই ভাবি।'

'বারে, আমি বুঝি রোজ পাগলা পীরের দরগায় পাঁচ পয়সা মানত দেই না!'

'দিস তো বেশ করিস! যা এবার ছাদে গিয়ে দেখ, মাল ঠিক মতো যেতে পারছে কি না।'

'আমি পারবো না, তোমরা কেউ যাও!'

মেয়েলি গলা বললো, 'বললেই হলো তোমরা যাও? আমাদের বুঝি কোনো কাজকম্ম নেই? তুই যদি—'

বলার মাঝখানে আগের মতো মৃদু ঘর্ঘর শব্দ হতেই গলার স্বর আরেক ধাপ নামিয়ে বললো, 'চুপ, ওস্তাদ আসছে।'

একটু পরেই ভারি কফজড়ানো গলা শোনা গেলো—'কি রে, তোরা যে এখানে

বসে বসে গুলতানি মারছিস—কাজকম্ম কিছু নেই?'

মেয়েলি গলা মিন মিন করে বললো, 'আমরা তো কাজেই নেমেছিলাম ওস্তাদ। ফেকু এসে বললো, ছাদের ওপর নাকি তিনটে লাশ পড়ে আছে। গিয়ে দেখি কিছুই নেই।'

ওস্তাদ বললো, 'এসব মামদোবাজি কবে থেকে শুরু করেছিস ফেকু? চাবুকটা কি নামাতে হবে।'

ফেকু হাউমাউ করে বললো, 'মাইরি বলছি ওস্তাদ, পাগলা পীরের কিরে—'

'চোপ!' চাপা গলায় ধমক দিলো ওস্তাদ—'সিনেমা কোম্পানির লোকজনগুলোর ঘুম না ভাঙিয়ে বুঝি শান্তি পাচ্ছিস না! যা বলার আস্তে বল!'

হেঁচকি তুলে ফোঁপাতে ফোঁপাতে ফেকু বললো, 'পীরের কসম ওস্তাদ, মিথ্যে বললে আমার যেন কুষ্ঠ হয়—পোষ্কার দেখেছি, ছাদের কিনারে তিনটে লাশ পড়ে ছিলো। দেখে আমি খবর দেবার জন্য নিচে এলাম। পাঞ্জুদা আর নওলাদাকে সঙ্গে নিয়ে আবার গিয়ে দেখি লাশগুলো নেই।'

'ছেলের লাশ না মেয়ের লাশ?' জানতে চাইলো ওস্তাদ।

একটু চুপ থেকে ফেকু বললো, 'একটা ছেলের দুটো মেয়ের।'

'বলিস কী!' অস্ফুট গলায় বললো ওস্তাদ—'মুন্সী একদিন বলেছিলো বটে জমিদার, তার বউ আর নর্তকীটা নাকি ভূত হয়ে এ বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়। শুনে আমি পাত্তা দেইনি। বলেছি তোমার গাঁজায় দোক্তা কম পড়েছিলো—কী না কী দেখেছো। মুন্সী তাহলে মিছে কথা বলেনি।'

মেয়েলি গলা বললো, 'সন্ধ্যে থেকে ফেকু কম মাল টেনেছে নাকি! ছাদের ঠাণ্ডা বাতাসে মাথা ঘুরে গিয়ে কি-না কি দেখেছে।'

কর্কশ গলায় ওস্তাদ বললো, 'আজ রাতে তুই তাহলে একা ছাদে ডিউটি দে নওলা! ফেকু তোর কাজ করুক!'

আমতা আমতা করে নওলা বললো, 'না, মানে ওস্তাদ—যদি সত্যি হয়—।'

'সে কথাই আমি বলছি।' চিবিয়ে চিবিয়ে ওস্তাদ বললো, 'কালই গিয়ে পীরের দরগার হুজুরকে বলবি আমাদের সবার জন্য একটা করে তাবিজ দিতে। তেনারা যদি কোন কারণে আমাদের ওপর অসন্তুষ্ট হন তাহলে কাজের ক্ষতি হবে।'

'ঠিক আছে ওস্তাদ।' ফেকু ঝটপট বললো, 'আমি কাল ভোরেই হুজুরের কাছে যাবো।'

'হুজুরকে জিজ্ঞেস করিস মালের স্টক কী রকম আছে। শেষ হলে আরও পাঠাবো।' একটু থেমে ওস্তাদ আবার বললো, 'আর পাঞ্জা শোন। কাল তুই একবার থানায় যাবি। ছোট কত্তাকে বলবি সিনেমা কোম্পানির লোকটাকে ডেকে যেন শাসিয়ে দেয়। ম্যালা ঝামেলা পাকাচ্ছে লোকটা। আমার তো সন্দ হচ্ছে ঝাড়বাতি ওই সরিয়েছে।'

পাঞ্জা বললো, 'এদিকে যে আরেক উৎপাত জুটেছে ওস্তাদ। কোত্থেকে স্কাউট কতগুলো এসে বাড়িতে তাঁবু গেঁড়েছে। হাড়বজ্জাত ছোঁড়াগুলো সারাদিন বাগান চষে

বেড়াচ্ছে। কাল আবার দুটোকে দেখলাম মন্দিরের পাশে ঘুরঘুর করে কী যেন খাতায় লিখছে।'

'ওসব তুই বুঝবি না। ইশকুলের ছায়াও তো মাড়াসনি কস্মিন কালে!' চাপা গলায় খিক খিক হেসে ওস্তাদ বললো, 'ওগুলো কোনো ঝামেলা নয়। আমি মুন্সীর কাছে খবর নিয়েছি। ওদের পরীক্ষা, পাঁচ দিনের জন্য তাঁবু গেঁড়েছে। পাঁচ দিন পরই চলে যাবে। এ ক'দিন সাবধানে চলাফেরা করিস। গায়ে পড়ে ওদের নজর কাড়ার কী দরকার। যা, এবার তোরা যে যার কাজে যা। আমি বেরুবো।'

এন্টিক রুমের নাটক এতক্ষণে শেষ হলো। আমরা তিন শ্রোতা এতক্ষণ রুদ্ধশ্বাসে ভারি দরজার গায়ে কান পেতে শুনছিলাম সেই নাটক। নিকোলাস স্যার হাত ধরে টানতেই চমক ভাঙলো। তিনজন পা টিপে অন্ধকারে করিডোর দিয়ে সিঁড়ির কামরা পেরিয়ে ড্রইং রুমে ঢুকলাম। এক সেকেন্ডের জন্য একবার টর্চ জ্বালালেন স্যার। বাইরের দরজার ছিটকিনি নিঃশব্দে নামিয়ে তিনজন ঝুল বারান্দার নিচে এলাম।

আন্দাজের ওপর থুজা ঝোপের কাছে এসে নিকোলাস স্যার চাপা গলায় ডাকলেন—'আরিফ।'

জোসেফ আর আরিফ বেরিয়ে এলো আড়াল থেকে। নিকোলাস স্যার ফিস্ ফিস্ করে বললেন, 'চলো কাজ হয়ে গেছে।'

অন্ধকারে নিকোলাস স্যারের তাঁবুতে যাওয়ার পথে আমাদের রাত প্রহরীরা চাপা গলায় জিজ্ঞেস করলো, 'কোনো বিপদ হয়নি তো?'

নিকোলাস স্যার ওদের আশ্বস্ত করে বললেন, 'না, তোমরা সাবধানে থেকো।'

আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখে অতি রাশভারি জোসেফও উত্তেজিত হয়ে উঠেছে। তাঁবুতে গিয়ে বসতেই বললো, 'সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়লো?'

'পড়লো মানে? বলো কী পড়েনি!' মুখ টিপে হেসে নিকোলাস স্যার আমাকে বললেন, 'পুরো ঘটনাটা পাঁচ মিনিটে ওদের বলো!'

আমার বিবরণ শুনে আরিফ আর জোসেফ দু'জনের চোখ ছানাবড়া।

জোসেফ বললো, 'এখন তাহলে আমরা কী করবো?'

'সেটা ঠিক করার জন্যই তো বসা।' নিকোলাস স্যার গম্ভীর হয়ে বললেন, 'এন্টিক রুমের নাটক থেকে কী কী সূত্র পাওয়া গেলো সেটা আগে আলোচনা করা যাক। তারপর ঠিক করা যাবে কোন পথে আমরা অগ্রসর হবো। প্রথমে রান্টু বলো, তোমার অবজার্ভেশন কী।'

কী বলবো মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে আমি বললাম, 'প্রথমেই আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি জমিদার বাড়িকে ঘাঁটি বানিয়ে একটা বড় গ্যাং সাংঘাতিক কোন কাজে ব্যস্ত। দ্বিতীয়ত, সিনেমা কোম্পানির কোনো লোককে এরা থানার কোনো অফিসারকে দিয়ে শায়েস্তা করতে চায়। এ থেকে বোঝা যায় থানার সঙ্গে এই দলের একটা ভালো সম্পর্ক আছে। তৃতীয়ত, পাগলা পীরর মাজারে যে হুজুরটা আছে সেও এদের লোক।'

'চমৎকার।' এক কথায় মন্তব্য করলেন নিকোলাস স্যার। এরপর তিনি শিবলীকে বললেন, 'তুমি কিছু এর সঙ্গে যোগ করতে চাও?'

শিবলী বললো, 'এন্টিক রুমে তালা দেয়া ছিলো। কিন্তু ওরা তালা না খুলে ভেতরে বসে কথা বলেছে। তার মানে এন্টিকে ঢোকার কোনো গোপন পথ আছে। ওরা কঙ্কালের মুখোশ পরে ঘুরে বেড়ায় যাতে লোক ওদের জমিদার বাড়ির ভূত মনে করে। আবার নিজেরা ভূতের ভয়ে অস্থির হয়ে তাবিজের কথা বলে। তার মানে লোকগুলো যথেষ্ট সাহসী নয়।'

আরিফ বললো, 'আমি অনেক সাহসী লোককে দেখেছি ভূত বিশ্বাস করে।'

আমি বললাম, 'ওদের তুমি সাহসী বলছো কেন?'

'সাহস এক জিনিস, বিশ্বাস আরেক জিনিস। যা দেখা যায় না তার বিরুদ্ধে তো লড়াই করা যায় না।'

আরিফের যুক্তি আমার পছন্দ হলো না। পাল্টা যুক্তি দিতে যাবো, নিকোলাস স্যার বাধা দিলেন—'আমরা মূল বিষয় থেকে দূরে সরে যাচ্ছি। ভূত আছে, কি নেই এ নিয়ে পরে ডিবেট হতে পারে, এখনকার বিষয় আলাদা। আমাদের অবজার্ভেশনে কিছু ফাঁক আছে। রান্টু বোধহয় লক্ষ্য করোনি ওদের ওস্তাদ কয়েকবার মুন্সীর কথা বলেছে। একি কেয়ারটেকার জবেদ মুন্সী? আমরা তা জানি না। জমিদার বাড়িকে ঘাঁটি বানিয়ে ওরা কি করছে জানি না। ওরা মাল পাচারের কথা বলেছে। কী মাল, কোথায় পাচার করছে—জানি না। সিনেমা কোম্পানির কোন লোককে ওরা শায়েস্তা করতে চায়—জানি না। মানে দাঁড়াচ্ছে আমাদের জানা আর অজানার মাঝখানে বড় একটা ফাঁক রয়ে গেছে।'

জোসেফ চিন্তিত গলায় বললো, 'এই ফাঁক ভরাতে হলে আমাদের আরো অবজার্ভ করতে হবে। জমিদার বাড়ির জিনিস কে চুরি করেছে তাঁর একটা হিন্টস ওরা দিয়েছে। রান্টুরা বলছিলো ওদের প্রোডাকশন ম্যানেজার দাশুবাবু নাকি সন্দেহজনক লোক। ওকে আরো যাচাই করে দেখতে হবে। ওর ওপর নজর রাখতে হবে। স্যুটিং কোম্পানিতে সন্দেজনক আর কেউ আছে কি-না সেটাও দেখতে হবে।'

আমি বললাম, 'ভাঙা মন্দিরের পাশের ঘরটা আর পাগলা পীরের মাজারের ওপরও নজর রাখা দরকার।'

'চমৎকার বলেছো।' নিকোলাস স্যারের মুখে প্রশংসার হাসি—'আমরা কাজগুলো কিভাবে করবো এখনই তাহলে ঠিক করে ফেলি।'

আমরা মাথা নেড়ে সায় জানালাম। নিকোলাস স্যার বললেন, 'কাল আমাদের ট্রেনিং পিরিয়ডে রান্টু আর শিবলীর কাজ হবে সিনেমার স্যুটিং দেখা। ইচ্ছে করলে খেলার সময়টাও ওরা স্যুটিং দেখে কাটাতে পারে।'

শিবলী লাজুক হেসে বললো, 'আর যদি দুপুরে ওদের সঙ্গে খেতে বলেন ইরফান ভাই?'

'তোমাদের ইচ্ছে।' হেসে বললেন নিকোলাস স্যার—'আরিফ সিনিয়রদের একটা গ্রুপ নিয়ে মন্দির অবজার্ভেশনে যাবে আর জোসেফ যাবে পীরের মাজারে রুটিন অবজার্ভেশনে। এটা যে ভিন্ন ধরনের অবজার্ভেশন, আমি চাই না আমাদের ছেলেরা বা বাইরের কেউ সেটা টের পাক। কাল ক্যাম্প ফায়ারের পর আবার আমরা মিটিঙে বসবো। এবার তাহলে শুতে যাও সবাই।'

স্যুটিং-এ সূত্রের সন্ধান

হালুটিয়ার জমিদারদের বাগান বাড়িতে আমাদের ক্যাম্পিং-এর চতুর্থ দিন শুরু হলো আগের দিনগুলোর মতোই আনন্দ উত্তেজনাময় পরিবেশে। নিকোলাস স্যারের সঙ্গে আমরা ক'জন রাত জেগে এতসব কাণ্ড করলেও তাঁবু-জীবনের রুটিনে কোথাও এতটুকু ফটল ধরেনি। রোজকার মতো আমরা পতাকা উত্তোলন করেছি, নিকোলাস স্যার আর ট্রুপ লিডার তাঁবু পরিদর্শন করে ডিয়ার পেট্রোলকে প্রথম পুরস্কার দিয়েছেন। তারপর পিটি করে ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়েছি ট্রেনিং-এ। সকালে অন্যদের দু'ঘন্টা ট্রেনিং হলেও আমার আর শিবলীর ট্রেনিং যে সন্ধ্যে পর্যন্ত চলবে আমাদের পেট্রল লিডারদের সেটা জানানো হয়েছে।

ইরফান ভাইদের স্যুটিং-এর জায়গায় যেতে যেতে শিবলী গদ গদ হয়ে বললো, 'ক্যাম্পিং-এ এসে কী দারুণ এক এ্যাডভেঞ্চারে জড়িয়ে পড়লাম বল তো!'

আমি বললাম, 'ওরা এখনো টের পায়নি, আমরা যে ওদের পেছনে লেগেছি। টের পেলে দেখিস কী হয়!'

'কেন কী হবে?' শিবলী অবাক হলো।

'কী হবে মানে! এমনি এমনি ছেড়ে দেবে ভেবেছিস? আমি ভাবছি শেষকালে না একটা খুনোখুনি কাণ্ড হয়ে যায়!'

শিবলী কাষ্ঠ হেসে বললো, 'কী যে বলিস তুই! মিছেমিছি ভয় পাইয়ে দিস!'

ইরফান ভাই আমাদের অবজার্ভেশনের কথা শুনে ভারি খুশি হলেন। সেদিন তাঁর স্যুটিং হচ্ছিলো দোতলার একটা বড় শোবার ঘরে। হিরো, হিরোইন, কমেডিয়ান তিনজনই আছে। ব্যস্ত হয়ে দাশুবাবুও ঘুরে বেড়াচ্ছে। ইরফান ভাই ইউনিটের সবাইকে স্কাউটিং সম্পর্কে বেশ খানিকটা জ্ঞান দিয়ে বললেন, 'জানো তো শিবলী যে আমাদের আফজাল হোসেনের ছোট ভাই!'

পুরোনো কালের নর্তকীর পোশাক পরনে, কড়া মেকাপ করা হিরোইন আদুরে গলায় বললো, 'ও-মা, তাই বুঝি! স্কাউটিং-এর ড্রেসে ওকে দারুণ হ্যান্ডসাম আর স্মার্ট লাগছে! আমি আফজাল ভাইকে বলবো, শিবলীকে একটা ছবিতে কাস্ট করতে।'

শুনে আমি মুখ টিপে হাসলাম। শিবলী তো লজ্জায় লাল-টাল হয়ে একাকার। গোলগাল ঢুলুঢুলু চোখ কমেডিয়ান গুলগুল্লা ঘুম জড়ানো গলায় বললো, 'ম্যাডাম, এই

গরীবের একটা ছোট ভাই আছে, পারলে চাকর-টাকরের পার্ট নেয়ার জন্য যদি সুপারিশ করতেন—কেনা গোলাম হয়ে থাকতাম।' ওর কথার ভঙ্গিতে সবাই হেসে উঠলো।

ইরফান ভাই হাসি চেপে বললেন, 'গুলগুল্লা, নিজের জায়গায় যাও। আর্টিস্টস্ গেট রেডি।'

পরচুলা পরে নবাব সাজা হিরো ডাকলো, 'মেকাপ, এদিকে এসো!'

বুড়ো মেকাপম্যান এসে হিরোর মুখে একটু পাফ বুলিয়ে আয়নাটা সামনে ধরলো। হিরো পরচুলাটা সাবধানে একটু চেপে বললো, 'ঠিক আছে।'

নায়িকা বুড়োকে বললো, 'আমাকে একটু গ্লিসারিন।'

ইরফান ভাই বললেন, 'আরেকটা মনিটর হবে, না টেক করবো?'

হিরোইন চোখে দু ফোঁটা গ্লিসারিন দিয়ে আদুরে গলায় বললো, 'আর কত মনিটর করবেন, এবার ফাইনাল টেক করুন।'

'ওকে।' ইরফান ভাই গলা তুলে বললেন, 'অল কোয়াইট, টেকিং। লাইটস?'

সঙ্গে সঙ্গে জ্বলে উঠলো হাজার পাওয়ারের পাঁচ ছটা লাইট।

ইরফান ভাই বললেন—'সাউণ্ড?'

কানে হেড ফোন লাগানো সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট বললো, 'রেডি।'

ইরফান ভাই বললেন, 'ক্যামেরা?'

নায়িকার মুখের ওপর ধরা ক্যামেরার বোতাম টিপে ক্যামেরাম্যান বললো, 'রোলিং।'

একজন এ্যাসিসটেন্ট নায়িকার মুখের ওপর ক্ল্যাপস্টিক ধরে 'রাজনর্তকী, সিকোয়েন্সে ফাইভ, শট নাইন, টেক ফোর।'—বলে সরে দাঁড়ালো।

এরপর ইরফান ভাই বললেন, 'এ্যাকশন।'

নায়িকা কান্না জড়ানো গলায় বললো—'না, না, জাঁহাপনা, এ কিছুতেই হতে পারে না। আমাকে আপনি এ কাজ করতে বলবেন না। দোহাই আপনার।' বলতে বলতে দু'হাতে মুখ ঢাকলো নর্তকী।

ক্যামেরা ঘুরে গেলো পাশে দাঁড়ানো নায়কের মুখের ওপর। আবেগ ভরা গলায় নায়ক বললো, 'তুমি ছাড়া একাজ যে আর কেউ করতে পারবে না জহরত বাঈ। আমার শেষ অনুরোধ তুমি রাখবে না?'

'কাট ইট, ওকে।' চেঁচিয়ে বললেন ইরফান ভাই। 'ওয়েল ডান সুমিত্রা, স্বপন। এবার পরের সিকোয়েন্স। প্রোডাকশন, চা!'

শিবলীর সঙ্গে আগেও কয়েকবার সিনেমার স্যুটিং দেখেছি এফডিসিতে গিয়ে। এভাবেই সব হয়। ইরফান ভাই আমাদের বললেন, 'চলো বারান্দায় গিয়ে বসি। পরের সিকোয়েন্সের জন্য রেডি হতে এক ঘন্টা লাগবে।'

ইরফান ভাইর কথা শেষ না হতেই দাণ্ডবাবু গলা তুলে বললো, 'পিচ্চি, বারান্দায় কয়েকটা চেয়ার দে তো!'

আমরা আর সিনেমার তিন আর্টিস্ট ইরফান ভাইর সঙ্গে বারান্দায় গিয়ে বসলাম। চা বোধহয় তৈরি হচ্ছিলো। মিনিট খানেকের মধ্যেই পিচ্চি একা ট্রেতে করে চা নিয়ে

এলো। আমাদের দুজনকে চা দেয়ার সময় সামান্য হাসলো।

জমানো লোক হলো কমেডিয়ান গুলগুল্লা। একটার পর একটা হাসির গল্প বলে সবার পেটে খিল ধরিয়ে দিলো। ইরফান ভাই একবার হাসতে হাসতে বললেন, 'তোমার বাপ-মা কতটা দূরদর্শী ছিলেন ভেবে দেখেছো গুলগুল্লা?

গুলগুল্লা চোখ কপালে তুলে বললো, 'ছিলেন নাকি!'

ইরফান ভাই হেসে বললেন, 'তারা কি করে জানবেন তুমি বড় হলে সিনেমায় কমেডিয়ান হবে, যে জন্যে তোমার নাম গুলগুল্লা রাখতে হবে।'

'তোবা তোবা!' নিজের দুই গালে আলতোভাবে দুটো চড় মেড়ে গুলগুল্লা বললো, 'আমার বাপ-মা এ নাম রেখেছেন নাকি! রেখেছেন তো ফিল্ম ডিরেক্টর বখতিয়ার। বাপ রেখেছিলেন মুনশী হেদায়েতুল্লাহ। জানেন না বুঝি, আমরা হলাম মুনশী মেহের উল্লাহর খান্দান। বখতিয়ার সাহেব নাম শুনে নাকচ করেদিলেন। লাহোরে নজর তখন শেরেগুল নামে বেশ নাম করেছে। ডিরেক্টর সাহেব শেরেগুলের সঙ্গে উল্লাহ যোগ করে গুলগুল্লা বানালেন। আমিও দেখলাম, নামটা পাবলিক নেবে। তাই রেখে দিলাম। খালি খারাপ লাগে পাড়ার বখাটেগুলোকে ক্লাবের জন্য চাঁদা না দিলে রোয়াকে বসে যখন চ্যাচায়—দো দো পয়সা গুলগুল্লা, বলে। কিছু বলতেও পারি না। একটা গুলগুল্লার দাম ও যে দুপয়সা। আসলে তো ওরা বলে—গুলগুল্লা, পয়সা দাও।'

গুলগুল্লার কথা বলার ধরন দেখে হেসে সবাই গড়াগড়ি খেলো। হাসতে হাসতে ইরফান ভাই বললেন, 'থলে ঝেড়ে সব এখানে উজাড় করে দিও না। কিছু সেটের জন্য রেখো।'

গোলগাল ভুঁড়িতে টোকা মেরে গুলগুল্লা, 'বিস্তার আছে স্যার। এতবড় স্টক কখনো খালি হবে না।'

একজন এ্যাসিসটেন্ট এসে ইরফান ভাইকে সেটে ডেকে নিয়ে গেলো। গুলগুল্লা শিবলীকে বললো, 'কী ওস্তাদ, নামটা পছন্দ হয়নি?'

শিবলী বললো, 'শুধু নাম কেন, আপনার সবই পছন্দ হয়েছে।'

'তাই নাকি।' গদগদ হয়ে গুলগুল্লা বললো, 'তাহলে তো আফজাল সাহেবের পরের ছবিতে নির্ঘাত চান্স পাচ্ছি। কী একটু সুপারিশ করবে না? আজকাল হ্যাংলা দত্ত কমেডিয়ানের পার্ট শুরু করায় আমার বাজার পড়ে গেছে।'

ইরফান ভাই ভেতরে যাওয়ায় প্রোডাকশন ম্যানেজার দাশুবাবু এসে বসলো আমাদের পাশে। বললো, 'স্যারের সামনে সিগারেট খাওয়ার জো নেই। নিজে খাবেন না, কাউকে খেতেও দেবেন না। আমরা ওঁর নাম দিয়েছি পেট্রল পাম্প।'

'কী যে মজা পাও দাশুদা, বুঝি না।' গুলগুল্লা ঠোঁট বাঁকিয়ে বললো, 'ছোটবেলায় একবার বন্ধুদের পাল্লায় পড়ে টেনে দেখেছিলাম। মাথা ঘুরে বমি টমি হয়ে একাকার। তারপর আর ছুঁয়েও দেখিনি।

দাশুবাবু আস্তে করে বললো, 'দেখে তো মনে হয় না এমন নিপাট ভালো মানুষ।' হিরো স্বপন শিবলীকে—কোন স্কুলে, কোন ক্লাসে পড়া হয়, সাবজেক্ট কী, কোন্‌ট পছন্দ—এসব কথা বলছিলো।

হিরোইন বললো, 'তোমার ভাই নতুন ছবিটায় কেন যে ধুমসি প্রতিমাকে হিরোইনের পার্ট দিলেন বুঝি না। ওর তো এখন খালার পার্ট করার কথা।' এই বলে হিরোইন নেইল কাটারের উখো দিয়ে নখের ডগা ঘষতে লাগলো।

হিরো বললো, 'এ ছবিতে তুমি এত বড় নখ রেখেছো কেন সুমিত্রা? আগেকার দিনে বুঝি নখ লম্বা রাখার ফ্যাশন ছিলো?'

'বারে আমি কী করবো! 'ঠোঁট ফুলিয়ে হিরোইন বললো, 'এগুলো যে আমার ক্যাবারে গার্ল ছবির কন্টিনিউটি। এখান থেকে গিয়েই ক্যাবারে গার্লের সুটিং করতে হবে যে।'

দাগুবাবু বললো, 'আমি স্যারকে বলেছিলাম ম্যাডামের নখের কথা। স্যার বললেন, ছবি পছন্দ হলে পাবলিক ওসব খুঁত ধরবে না। বড় জোর দু'একটা কাগজে সাংবাদিকরা ও নিয়ে খোঁচাতে পারে। ওতে কিছু আসে যায় না।'

শিবলী দাগুবাবুকে বললো, 'আপনারা এই নাচঘরে কোন স্যুটিং করেননি?'

দাগুবাবু বললো, 'করি নি মানে! দুটো লম্বা নাচের সিকোয়েন্স আছে এই ঘরে। একটা কমপ্লিট, আরেকটার অর্ধেক বাকি। ওখানে হেলেনের থাকার কথা।'

'ঝাড়বাতির চুরি হয়ে যাওয়াতে আপনাদের সুটিং-এ অসুবিধে হবে না?'

শিবলীর কথা শুনে একটু অপ্রস্তুত হলো দাগুবাবু—'না, মানে—স্যার নিশ্চয় কোনও ভাবে ম্যানেজ করবেন।'

'আপনার কী ধারণা। ওটা চুরি হলো কিভাবে?'

শিবলীর কথায় এবারও নার্ভাস মনে হলো দাগুবাবুকে। কমেডিয়ান গুলগুল্লা—'আমি একটু বাথরুম থেকে আসি,' বলে উঠে গেলো। দাগুবাবু কাষ্ঠ হেসে বললো, 'কী করে জানবো বলো! সারাদিন স্যুটিং-এর খাটা-খাটনি—রাতে মড়ার মতো ঘুমিয়েছি। সকালে শুনি এই কাণ্ড।'

হিরো স্বপন ভুরু কুঁচকে বললো, 'আপনি যাই বলেন দাগুবাবু আমার ধারণা এতে ইউনিটের কারো হাত আছে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ, নাচঘরের বাইরের তালা দেয়া, চাবি রয়েছে আমাদের কাছে আর কেয়ারটেকারের কাছে। তালা না ভেঙে জিনিসটা কে নিতে পারে বলুন!'

দাগুবাবু কৈফিয়ৎ দেয়ার সুরে বললো, 'বছরের পর বছর খালি পড়ে থাকে বাড়িটা। বাড়তি আরেকটা চাবি কারো পক্ষে বানিয়ে রাখা অসম্ভব নয়।'

'আমার একটুও ভালো লাগে না চুরির গল্প শুনতে।' আদুরে গলায় বললো হিরোইন সুমিত্রা—'তার চেয়ে দাগুবাবু ভূতের গল্প বলুন। সেদিন কী দারুণ ভূতের গল্প বললেন—বেচারি হেলেন ভয়ে পালালো। বলে খিলখিল করে হাসলো।

দাগুবাবু লাজুক হেসে বললো, 'ওগুলো গল্প নয় ম্যাডাম, একেবারে সত্যি ঘটনা। অনেকেই ওদের এ বাড়িতে দেখেছে।'

পিচ্চি এসে বললো, 'সেট রেডি, আপনেগো বোলাইতাছে।'

হিরো-হিরোইন উঠে সেটে গেলো। দাগুবাবু চাপা গলায় বললো, 'তোমরা কেয়ার টেকার মুনশীকে দেখেছো? লোকটাকে আমার মোটেই সুবিধের মনে হয় না। দেখো গে

আমাদের ওপর দোষ চাপাবার জন্য ও নিজেই চুরি করেছে। নইলে পুলিশে খবর দিতে ওর এতো আপত্তি কেন?'

আমি বললাম, 'ওর শুধু নাম শুনেছি। আমাদের সঙ্গে এখনো পরিচয় হয়নি। তিনি তো সাত দিনে একবার আসেন।'

'সে তো সবার নাকের ডগা দিয়ে আসা। লুকিয়ে লুকিয়ে রোজ আসতে তাকে বারণ করছে কে?'

শিবলী চিন্তিতভাবে মাথা নাড়লো। আমি বললাম, 'আমরা একটু স্যুটিং দেখবো।'

দাগুবাবু ব্যস্ত গলায় বললো, 'অবশ্যই দেখবে, একশবার দেখবে। চলো তোমাদের বসিয়ে দি।'

রাজনর্তকী ছবিতে কমেডিয়ান গুলগুল্লার পার্ট ছিলো রাজার বিদুষকের। রাজদরবারের লোক হাসানো তার কাজ। দুপুরের আগে তোলা দুটো সিকোয়েন্সে ছিলো সে। একথা মানতেই হবে নায়ক স্বপনের চেয়েও গুলগুল্লা বড় অভিনেতা। স্যুটিং-এর সময় কী কষ্টে যে হাসি চেপেছি সে আর বলার নয়। কারণ, এতটুকু শব্দ করলেই শট বাতিল হয়ে যাবে। হয়েছেও একবার। রাজার ডাক শুনে হন্তদন্ত হয়ে আসতে গিয়ে বিদুষক ধপাস করে পড়বে—এটা টেক করার সময় যেই না গুলগুল্লা আছাড় খেলো, অমনি নায়িকা সুমিতা খিল খিল করে হেসে উঠলো। ইরফান ভাই 'কা-ট,' বলে চিৎকার করে উঠলেন। সঙ্গে সঙ্গে সুমিত্রা, 'সরি', বলে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে পাশের ঘরে পালালো।

দুপুরে আমরা ইরফান ভাইদের সঙ্গে খেলাম। খেতে বসে একটা জিনিস খুব খারাপ লাগলো। ইরফান ভাইর সঙ্গে শুধু হিরো-হিরোইন আর আমরা দুজন ছিলাম। দাগুবাবু, ভিলেন, কমেডিয়ান, ক্যামেরাম্যান আর সাউণ্ড রেকর্ডিস্ট বসেছে আলাদা। বাদ বাকিরা আরেক জায়গায়। খাওয়ার মানও তিন রকমের। বেশি খারাপ লাগলো যখন দেখলাম, আমাদের দেয়া হলো মস্তো বড়ো কইমাছ, মুরগির মাংশ এই সব, আর পিচ্চিটা শুধু একটা তরকারি দিয়ে ভাত খেলো।

শিবলী অবশ্য পরে বলেছে সিনেমা কোম্পানিগুলোর স্যুটিং-এ এটাই নাকি নিয়ম। কেউ কোনো প্রতিবাদ করে না। অথচ আমরা স্কাউটরা তাঁবুতে সবাই একই খাবার খাচ্ছি, একই কাজ করছি, একই সঙ্গে ঘুমোচ্ছি। শওকত, রব্বানীরা যে মস্ত বড়লোকের ছেলে—কোন ও দিন কেউ এ নিয়ে একটা কথাও বলেনি। বরং সবাই ক্যাম্পে আসার আহ্লাদে সারাক্ষণ আটখানা হয়ে থাকে।

বিকেলের সুটিং ছিলো শুধু হিরো-হিরোইনের। গুলগুল্লার কোনো কাজ ছিলো না। দুপুরে খাওয়ার পর পর সেই যে নিচে নামলো আর তার পাত্তা নেই। বিকেলে টিব্রেকের সময় দাগুবাবুকে জিজ্ঞেস করেছিলাম গুলগুল্লার কথা। বিরক্ত হয়ে দাগুবাবু বললো, 'ওর কথা আমাকে জিজ্ঞেস কোরো না। সারাক্ষণ আছে ধান্দাবাজিতে। কোথাও পীর ফকিরের খোঁজ পেলেই হলো। হত্যে দিয়ে পড়ে থাকবে। হ্যাংলা দত্ত এসে ওর বাজার দর কমিয়ে দিয়েছে—এ নিয়ে সারাক্ষণ কাঁদুনি গাইবে। এখানে এসেও খুঁজে খুঁজে পীরের মাজার একটা পেয়ে গেছে।'

তারপর গলাটা একধাপ নামিয়ে দাশুবাবু বললো, 'এইসব মাজারে ঘুরে ঘুরে যা হবার তাই হয়েছে। আজকাল শুনি নেশা-টেশাও নাকি করে!'

শুনে ভারি মায়া হলো গুলগুল্লার জন্য। শিবলী বললো, 'মেজদাকে আমি বলবো পরের ছবিতে ওকে নিতে।'

জমিদার বাড়িতে ইলেকট্রিসিটি আসেনি। ডায়নামো চালিয়ে স্যুটিং-এর কড়া আলোর ব্যবস্থা করতে হয়েছিলো। নায়িকা সুমিত্রা একবার বললো, 'স্যুটিং দেখতে খারাপ লাগে না কিন্তু করা যে কী ঝকমারি। ঘন্টার পর ঘন্টা মুখের ওপর এসব আলো পড়লে টের পাবে।'

একবার একটানা অনেকক্ষণ একা শট দিয়ে ঘেমে-টেমে একাকার হয়ে সুমিত্রা বারান্দায় এসে বসলো। আমরা তখন বারান্দার চারপাশটা দেখছিলাম, কেউ দেয়াল বেয়ে দোতলায় উঠতে পারে কি-না। আলাপ করার জন্য সুমিত্রাই প্রথম ডাকলো আমাদের। শিবলীকে বললো, 'তোমার ভাইর মাত্র একটা ছবিতে আমি কাজ করেছি।'

শিবলী লাজুক হাসলো—'জানি। ওটার জন্য আপনি এ্যাওয়ার্ডও পেয়েছিলেন। আপনার অভিনয় খুব সুন্দর হয়েছিলো।'

সুমিত্রা হেসে বললো, 'তার জন্যে প্রশংসা অবশ্য আফজাল ভাই পাবেন। তিনি জানেন কিভাবে কাজ আদায় করে নিতে হয়।'

শিবলী কয়েক মুহূর্তে চুপ থেকে কী যেন ভাবলো। তারপর দুম করে প্রশ্ন করলো, 'আচ্ছা সুমিত্রাদি আপনি কী খেতে ভালোবাসেন?'

হাসতে হাসতে সুমিত্রা বললো, 'কেন বল তো? হঠাৎ সাংবাদিকদের মতো প্রশ্ন করছো?'

'না, এমনি জানতে ইচ্ছে হলো।' ভারি লজ্জা পেলো শিবলী।

চিবুকে আঙুল রেখে একটু ভাবলো সুমিত্রা। তারপর রহস্যভরা গলায় বললো, 'কাউকে বলবে না, আমার সবচেয়ে ভালো লাগে শুটকির ভর্তা দিয়ে পান্তাভাত খেতে।'

'আপনার মোরগ পোলাও, বিরিয়ানী এসব ভালো লাগে না?'

শিবলীর প্রশ্ন শুনে আমি মুখ টিপে হাসলাম। আর সুমিত্রার নাক কুঁচকে গেলা—'একেবারে সহ্য করতে পারি না ওসব। একগাদা ঘি জবজব করে, লোকে কি করে যে খায়.....মাগো!' বলে শিউরে উঠলো সে।

'তার মানে আপনি স্যুটিং-এ এসে কখনো এসব খাবার খান না।'

'তার চেয়ে বরং আমি উপোস থাকবো, তাও ভালো।'

শিবলী হেসে বললো, 'মেজদার নতুন ছবির হিরোইন স্যুটিং-এ এসে দুবেলা বিরিয়ানী খান'।

'সেজন্যে দেখ না কি মোটা হয়েছে। আমার মতো দুটোর সমান। আমি তো বলি ওর এখন বড় ভাবী নয় তো খালার পার্ট করা উচিত।'

শিবরীর কথায় হিরোইন সুমিত্রা খুশি হলো। শিবলীর কাছে শুনেছি এসব হিরোইনরা নাকি একজন আরেকজনকে দুচোখে দেখতে পারে না।

সেদিন স্যুটিং শেষ হতে হতে সন্ধ্যা হয়ে গেলো। তাঁবুতে গিয়ে দেখি এনামুল

ক্যাম্প ফায়ারের অনুষ্ঠানের মহড়া দিচ্ছে। আমাকে দেখে মুখ টিপে হেসে বললো, 'সারাদিন নিশ্চয়ই অনেক ধকল গেছে। কেতলিতে চা আছে, খেয়ে নাও।'

চা নিতে এসে দেখি মুন্না রান্না করছে। বললো, 'কী মজা তোর, সারাদিন স্যুটিং দেখলি, অবজার্ভেশনও সারলি। একেই বলে এক ঢিলে দুই পাখি মারা। আমাদের জো ভাই নিয়ে গেলো কোন এক পীরের মাজারে। হুজুরটা আমাকে বললো আমি নাকি পরীক্ষায় ফার্স্ট হবো। কী বুজরুকি বল তো! যদি বলতো স্কুল ফুটবল টিমে ক্যাপ্টেন হবো, তাহলে না হয় মানতাম।'

আমি চা খেতে খেতে মৃদু হেসে বললাম, 'পীর ফকিরকে এভাবে হেনস্তা করিসনি মুন্না, জিভ-টিব নাকি খসে যায় শুনেছি।'

চাপা গলায় মুন্না বললো, 'ওসব বুজরুকি আমাদের কাছে চলবে না। জো ভাই বলছে ওই হুজুরটা নাকি বিরাট ক্রিমিনাল।'

আমি বললাম, 'এসব কথা বাইরে বলিস না, পিটুনি খাবি।'

রাতের ক্যাম্প ফায়ারে এনামুল আমাদের দিয়ে জুলু ড্যান্স করলো। সঙ্গে সেই বিখ্যাত গান—'গিং গ্যাং গলি গলি গলি গলি ইয়াশ্যা গিং গ্যাং গো, হে—লা হেলা শে—লা, হেলা শেলা হোঃ। শেরিবেরি শেরিবেরি শেরিবেরি, হোম্পা হোম্পা---'

ক্যাম্প ফায়ার যারা দেখতে এসেছিলো মনে হলো তাদের সবাইকে পালক দিয়ে সুড়সুড়ি দেয়া হচ্ছে—এমনই হুল্লোড় বইয়ে দিলো। দেখলাম সিনেমা কোম্পানির দাশুবাবু, পিচ্চি আর কয়েকজন এসেছে। দুঃখের বিষয় পুরোনো অনুষ্ঠান দেখাবার জন্য আমরা ফার্স্ট হতে পারলাম না। সেটা জুটলো টাইগার পেট্রলের ভাগ্যে। ওরা বিপি-র বই থেকে 'এলসডন মার্ডার কেস' নাটকটা করছিলো। তবে দাশুবাবু আগে দেখেনি বলে আমাদের নাচের খুব প্রশংসা করলো। ক্যাম্প ফায়ারের পর তলব পড়লো নিকোলাস স্যারের তাঁবুতে। আগের রাতের মতো আরিফ, জোসেফ, শিবলী আর আমি। হারিকেনের চারপাশে গোল হয়ে বসলাম আমরা সবাই। প্রথমে আমার আর শিবলীর বিবরণ দেয়ার পালা। সুটিং-এ যা দেখেছি তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিলো লোকজনের সঙ্গে আমাদের কথাবার্তা। লক্ষ্য করলাম আমার বলার ফাঁকে ফাঁকে নিকোলাস স্যার ডায়েরিতে অনবরত নোট নিচ্ছেন।

আমাদের পর জোসেফের পালা। জোসেফ, মুন্না আর নঈম গিয়েছিলো পীরের মাজারে। পাগলা পীরের মাজারটা একেবারে নদীর ধারে—মাজারের কেয়ারটেকার হচ্ছে লম্বা কালো দাড়িওয়ালা মিশমিশে কালো দশাসই শরীরের এক হুজুর। জোসেফদের খুব খাতির করে বসিয়েছে, মাজারের তবারক নকুলদানা খেতে দিয়েছে। মুন্নাকে বলেছে পরীক্ষায় ফার্স্ট হবে আর নঈমকে বলেছে অনেক দৌলত হবে ওর।

হুজুরের জনা পাঁচেক এ্যাসিসেটেন্ট ছিলো মাজারে। কারো চুলদাড়ি জট পাকিয়ে গেছে, কারো গায়ে শেকল জড়ানো, সর্বক্ষণ জিকির করছে। জোসেফ নিজের ভক্তি প্রমাণের জন্য হুজুরকে সোয়া তিনটাকা নজরানা দিয়েছে। তারপর বিনীতভাবে জানতে চেয়েছে হুজুরদের খরচপত্রের টাকা কোত্থেকে আসে। হুজুর বলেছে 'উপরওয়ালা দুনিয়ার সবার রিজিকের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। মাজারে ভক্তরা আসে, নজর-নেওয়াজ

দেয়। তাছাড়া গুদাম একটা আছে, এক হেকিম সাহেব দাওয়াখানার মালপত্র রাখে। তিনি কিছু ভাড়া দেন।'

জোসেফরা সেই গুদামে নৌকা থেকে মাল নামিয়ে রাখতেও দেখেছে। কী মাল বলতে পারবে না, বস্তায় ভরা ছিলো। দেখে মনে হয়েছে হেকিমি ওষুধের গাছ গাছালি জাতীয় কিছু।

হুজুরও জোসেফদের খবর-টবর নিয়েছে। স্কাউট কী, ক্যাম্পিং-এ কেন আসে, কী করে—এইসব। জোসেফ হুজুরকে দাওয়াত দিয়েছিলো ক্যাম্প ফায়ারে আসার জন্য। হুজুর বিনয়ের সঙ্গে বলেছে—'আমার যে বাবার জায়গা ছেড়ে নড়ার হুকুম নেই। তোমরা বরং শুক্রবারে এসো। প্রত্যেক শুক্রবার হালকায়ে জিকির হয়, গরু জবই করা হয়। এসে তবারক নিয়ে যেও।'

মাজারের ভেতরে হুজুরের হুজুরাখানা আছে। সেখানে উঁচু দরের ভক্ত ছাড়া অন্য কারো ঢোকা নিষেধ। জোসেফরা থাকতে দুজন হুজুর টাইপের লোক এসেছিলো। ওদের নিয়ে মাজারের হুজুর কিছুক্ষণের জন্য হুজরাখানায় ঢুকেছিলো। জোসেফরা মাজার পরিদর্শন শেষ করে দুপুরে খাওয়ার আগেই চলে এসেছে।

আরিফের ওপর দায়িত্ব ছিলো ভাঙা মন্দিরের এলাকায় অবজার্ভেশন করা। ঈগল পেট্রলের হারুন আর র‍্যাবিট পেট্রলের বেলালকে নিয়ে আরিফ সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত মন্দিরের ওপর নজর রেখেছে। গাছ পালা আর ভাড়া ইট সুরকির ওপর নোট নিয়েছে বিস্তর তবে নজরে পড়ার মতো কিছুই দেখেনি। আমাদের মতো পাশের ভাঙা ঘরের একটায় তালা, আরেকটায় ঘোড়ার নাদি দেখেছে। আশেপাশের লোকজনকে জিজ্ঞেস করেছে মন্দিরের ধারে কাছেও কেউ এখন যায় না। নাকি এক সময় নিয়মিত নরবলি হতো। ভীষণ জাগ্রত ছিলো মন্দিরের শ্মশানকালী।

সন্ধ্যেবেলা ফেরার পথে ওদের সঙ্গে দাশুবাবু দেখা হয়েছে। মুরগি কিনতে বেরিয়েছে, কাল দুপুরে নাকি বিরিয়ানী হবে। আরিফদের সন্ধ্যের পর বাইরে ঘোরাফেরা করতে বারণ করেছে। রাতে ক্যাম্পে ফায়ার দেখতে আসবে, তাও বলেছে।

নিকোলাস স্যার শুধু দাশুবাবুর প্রসঙ্গটুকু শোনার সময় নোট নিলেন। জোসেফের বলার সময় বেশ কয়েকবার নোট নিয়েছিলেন তিনি। তবে সবচেয়ে বেশি নোট নিয়েছেন আমাদের বলার সময়। সবার কথা শেষ হওয়ার পর তিনি বললেন, 'আমরা যদি বেশ কিছুদিন এখানে থাকতে পারতাম তাহলে গোটা রহস্যটা আমরাই উদ্‌ঘাটন করতে পারতাম। কিন্তু আমরা আর মাত্র একদিন আছি। অর্থাৎ কালকের দিনটা শুধু। পরশু ভোরে আমরা এখান থেকে চলে যাবো। সেজন্যে এই পরিস্থিতিতে পুলিশে খবর দেয়া ছাড়া উপায় নেই। কাল সকালে পুলিশ আসবে। যা কিছু করার ওরা করবে। অবশ্য আমাদের এসব অবজার্ভেশন রিপোর্ট ছাড়া তারা কিছু করতে পারতো না। এজন্যে অগ্রিম ধন্যবাদও পেয়ে গেছি।'

আমি বললাম, 'পুলিশকে জানানো কী ঠিক হলো? থানায় যে ওদের লোক আছে?'

'জানি সেটা।' মৃদু হেসে নিকোলাস স্যার বললেন, 'আজ বিকেলে আমি এসপির সঙ্গে কথা বলেছি। তিনি আমাদের সময় স্কাউটিং করতেন। পড়তেন তোমাদের স্কুলেই।

আমি যদিও পড়াশোনা করেছি বান্দুরাতে, স্কাউটিং-এর সুবাদে ওঁর সঙ্গে পরিচয় ছিলো। শুনে খুব আগ্রহ দেখালেন।' একটু থেমে নিকোলাস স্যার বললেন, 'আজ আমরা শেষবারের মতো জমিদার বাড়িতে ঢুকবো। দেখা যাক এসপিকে দেয়ার মতো আরো কোন তথ্য পাওয়া যায় কি না। ইরফানকে আমি বলে রেখেছি।'

কথাগুলো বলার সময় নিকোলাস স্যার বোধহয় ভাবতেও পারেননি সেই রাতে জমিদার বাড়িতে আমাদের জন্য কী ভয়ঙ্কর বিপদ অপেক্ষা করছিলো।

বাঘের গুহায় বন্দী

আরিফ আর জোসেফকে আগের রাতের মতো থুজা ঝোপের পাশে বসিয়ে রেখে নিকোলাস স্যার, শিবলী আর আমি জমিদার বাড়িতে ঢুকলাম। ইরফান ভাইকে আগে বলা ছিলো কোন দরজা দিয়ে আমরা ঢুকবো। দরজার ছিটকিনি নামানোই ছিলো। নিকোলাস স্যারে কথামতো আমরা ছাদে উঠলাম। ছাদে উঠে ওরা কিছু পাহারা দেয়, না কোনও সংকেত পাঠায় আগে জানা দরকার।

রাত তখন প্রায় এগারোটা। পূবের আকাশে ম্লান এক টুকরো চাঁদ—অন্ধকার খুব বেশি দূর করতে পারেনি। নিকোলাস স্যার বললেন, 'কাল ছাদে ওরা যেরকম ভূত দেখেছে, মনে হয় না আজ কেউ উঠার সাহস পাবে।'

তবু সাবধান হওয়ার জন্য ছাদে পা রাখার আগে চিলেকোঠার দরজার ফাঁক দিয়ে গোটা ছাদটা দেখে নিয়েছিলাম। নিশ্চিন্ত হয়ে দক্ষিণের কার্ণিশের কাছে এলাম। জোসেফ বলাতে খেয়াল হলো নদীর ধারে একটা মাজারের মতো রয়েছে গাছের একটু আড়ালে। মাজারে সম্ভবত হ্যাজাক জ্বলছে, বেশ জোরালো মনে হলো আলোটা।

হঠাৎ চাপা গলায় শিবলী বললো, 'স্যার ও দিকে দেখুন।'

ওদিকে মানে পুব দিকে, যেদিকে ভাঙা মন্দির। বেশ উঁচুতে একটা আকাশ বাতি জ্বলছে। তখনই জ্বালিয়ে কেউ উড়িয়ে দিয়েছে। কারণ, ছাদে উঠেই একবার তাকিয়ে ছিলাম ওদিকে। তখন কিছু দেখিনি।

নিকোলাস স্যার বললেন, 'খেয়াল করে দেখো, কোথাও নিশ্চয়ই আলোর সংকেত দেখতে পাবে।'

সংকেত খুঁজতে গিয়ে আমরা তিনজন বিভোর হয়েছিলাম—কখন যে ওরা আমাদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে টেরও পাইনি। যখন টের পেলাম তখন আর কিছুই

করার ছিলো না, সামান্য ধস্তাধস্তি করা ছাড়া। কারণ, আমাদের তিনজনকে এক সঙ্গে জাপটে ধরেছে। হাতে দুটো পিছমোড়া করে ধরা, ছাড়াবার চেষ্টা করতেই মোচড় দিলো। তিনজন আমাদের ধরেছে আর তিনজন আমাদের সামনে—দুজনের হাতে ছুরি আর একজন হারিকেন হাতে দাঁড়িয়ে। সবার পরনে সাদা আলখাল্লা, মুখে কঙ্কালের মুখোশ আঁটা। হারিকেনওয়ালা বললো, 'টু শব্দ করোছো—পেটটা ফাঁসিয়ে দেবো। ভালো মানুষের মতো চলে এসো।'

একজন গামছার মতো কাপড় একটা দিয়ে নিকোলাস স্যারের মুখ বেঁধে ফেললো। আমরা ছোট বলে বাঁধার হাত থেকে রেহাই পেলাম। সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় আরেকবার হাত ছাড়ানোর চেষ্টা করেছিলাম। লোকটা এমন এক মোচড় দিলো-মাথার ভেতর ঝন করে উঠলো। মোলায়েম গলায় একজন বললো, 'কেন মিছেমিছি কষ্ট পাচ্ছো। এমন চিন্তা ঘুণাক্ষরেও মাথায় এনো না।'

নেতা গোছের লোকটা চাপা গলায় বললো, 'কী হয়েছে?'

'কিছু না।' মোলায়েম গলায় বললো, 'পাখির বাচ্চা ডানা ঝাপটাতে চায়।'

সিড়ি দিয়ে আগে নামছিলেন নিকোলাস স্যার, তারপর আমি, সবার শেষে শিবলী। মাথার ভেতর হাজারটা চিন্তা একসঙ্গে ভিড় জমালো। বাইরে যেভাবে হোক খবর পাঠাতে হবে। কিংবা কোথায় যাচ্ছি তার ট্র্যাক রেখে যেতে যেতে হবে।

নামার সময় কাঠের সিঁড়িতে একটু জোরে পা ফেলেছিলাম যদি শব্দ শনে স্যুটিং কোম্পানির কেউ ওঠে! মোলামেয় গলা আবার হাতে মোচড় দিয়ে বললো, 'কোনও ফন্দি খাটবে না। ফের যদি শব্দ হয় তাহলে হাত দুটো নিচে নামার আগে ধড় থেকে আলাদা হয়ে যাবে।'

আরেকজন বললো, 'এক আধটু শব্দ শোনার অভ্যেস আছে সিনেমাঅলাদের। ওরা জানে এসব তেনাদের কাজ।'

সামনের হারিকেনওয়ালা নিচে নেমে এন্টিকরুমে যাওয়ার করিডোরে ঢুকলো। আমি সেরকমই অনুমান করেছিলাম। অবাক হলাম করিডোর পা রেখে। কাঠের পাটাতনের করিডোরের মাঝখানে চারকোণা এক গজ বাই এক গজ জায়গা ফাঁকা। ওপাশে হারিকেনওয়ালা দাঁড়িয়ে। ফাঁকা জায়গা দিয়ে কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে নিচে।

নামার আগে সমানে লোকটা দড়ি দিয়ে নিকোলাস স্যারের হাত বেঁধে ফেললো। হারিকেনওয়ালা চাপা গলায় বললো, 'সাবধান, কোন রকম ফন্দি-ফিকির চলবে না। একজন একজন করে নামো।'

দুজনের হাতে চকচকে ছুরি দেখে আমাদের নিরাপত্তার কথা ভেবেই নিকোলাস স্যার বিনাপ্রতিবাদে নেমে গেলেন। ওদের একজন তাঁর সামনে, আরেকজন পেছন পেছন নামলো। এবার আমার পালা। মনে হলো এই কালো সুড়ঙ্গের ভেতর ঢুকলে কোনওদিন আর বেরোতে পারবো না। কেউ কোনওদিন টেরও পাবে না আমরা কোথায় হারিয়ে গেছি। লোকজন বলবে জমিদারবাড়ির অতৃপ্ত আত্মারা বুঝি গায়েব করে দিয়েছে।

পেছনের লোকটা ধাক্কা দিলো নামার জন্য। ভেবে কোনও কুল কিনারা না পেয়ে

মরিয়া হয়ে চিৎকার করে ইরফান ভাইকে ডাকতে গেলাম। শুধু 'ই'—বলতে পেরেছি তারপরই ঘাড়ের ওপর প্রচণ্ড জোরে কী যেন পড়লো। ব্যাস আর কিছুই আমার মনে নেই।

শিবলী পরে বলেছে আমার মাথাটা নাকি এমনভাবে ঝুলে পড়েছিলো যে হারিকেন ওয়ালা পর্যন্ত ঘাবড়ে গিয়েছিলো। দু'সেকেন্ডের ভেতর সবাই নেমে কাঠের পাটাতন টেনে মুখটা সমানভাবে বন্ধ করে দিয়েছিলো।

জ্ঞান ফেরার পর দেখি মাটির নিচের একটা ঘরে হাত বাঁধা অবস্থায় পড়ে আছি মেঝের ওপর। পাশে নিকোলাস স্যার আর শিবলী দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে। কেউ বোধহয় মুখে পানি ঢেলেছে। জামাটা ভিজে একাকার। ঘাড়ে প্রচণ্ড ব্যাথা—মনে হলো তুলতে পারবো না। চোখ মেলে তাকাতেই একজন বললো, 'জ্ঞান ফিরেছে।'

প্রথমে চোখ পড়েছিলো নিকোলাস স্যারের ওপর। দুচোখে ভীষণ উদ্বেগ নিয়ে ব্যাকুল হয়ে তাকিয়ে ছিলেন আমার দিকে। শিবলীর চোখ দেখে মনে হলো বুঝি কেঁদে ফেলবে। মুখোশপরা গুণ্ডাদের একজন আমাকে ধরে দেয়ালের সঙ্গে হেলান দিয়ে বসিয়ে দিলো। ব্যাথায় অস্থির হয়ে চোখে কেবল তারা দেখছিলাম।

ছটা গুণ্ডা লাইন করে আমাদের দু'পাশে দাড়িয়ে। সামনে চেয়ারে বসা কুচকুচে মুশকো চেহারার এক ষণ্ডামতো লোক। কফ জড়ানো গলায় বললো, 'ছেলের তো জ্ঞান ফিরেছে, মাস্টার সাহেব এবার নিশ্চয়ই আমার কথার জবাব দেবেন। আমার প্রত্যেকটা কথার ঠিক জবাব চাই। জবাব না পেলে আপনার ছেলে দুটোকে—দেখবেন, চোখের সামনে জ্যান্ত চামড়া খুলে নেবো। বলুন, এসপির কাছে কেন গিয়েছিলেন?'

নিকোলাস স্যার একবার আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'আমাদের গ্র্যান্ড ক্যাম্প ফায়ারের অনুষ্ঠান দেখার জন্য নিমন্ত্রণ করতে।'

'গ্র্যান্ড ক্যাম্প ফায়ার কী?'

'ক্যাম্পের শেষ রাতে যে অনুষ্ঠান হয়। তাঁবুর জলসা বলে। রোজ রাতেই হয়, তবে শেষ রাতেরটায় জাঁকজমক বেশি হয়। সবাই তাদের সেরা অনুষ্ঠানগুলো দেখায়।'

গুণ্ডাদের একজন বললো, 'কাল রাতে আমি দেখেছি ওস্তাদ। ছোঁড়াগুলো ভারি সুন্দর নাচতে গাইতে পারে।'

'চোপ!' চাপা গলায় মুশকো চেহারা ওকে ধমকে দিয়ে আবার নিকোলাস স্যারকে জিজ্ঞেস করলো, 'আপনি যে সত্যি কথা বলেছেন তার প্রমাণ কী?'

নিকোলাস স্যার নির্বিকার গলায় বললেন, 'এসপিকে জিজ্ঞেস করলেই হয়।'

'হু'। একটু থেমে কী যেন ভাবলো মুশকো। তারপর বললো, 'সকালে পাগলা পীরের মাজারে কেন ছেলে পাঠিয়েছিলেন?'

'ক্যাম্পিং-এ এলে ওদের অবজার্ভেশন টেস্ট দিতে হয়। যেখানে ক্যাম্প হয়--গোটা এলাকায় দর্শনীয় স্থান যা আছে সব কিছুর বিবরণ লিখতে হয় ওদের। ম্যাপ বানাতে হয়।'

'তারপর ওসব সরকারের গোয়েন্দা পুলিশকে সাপ্লাই দেয়া হয়?'

'স্কাউটদের সঙ্গে সরকারের গোয়েন্দা পুলিশের কোনো সম্পর্ক নেই। শুধু যুদ্ধের

সময় এসব ট্রেনিং দরকার হয়, যখন স্কাউটরা দেশের সৈন্যদের সাহায্য করে।'

'কাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করনে আপনারা?'

'আমাদের দেশের ওপর যারা হামলা চালাবে।'

'কাল রাতে ও আপনারা জমিদার বাড়ির ছাদে উঠেছিলেন?

'হ্যাঁ।'

'কেন উঠেছিলেন?'

'আমার ছেলেরা এ বাড়িতে অনেক রাতে আলো দেখেছিলো। আমরা ভেবেছিলাম বাড়িতে চোর ঢুকেছে। ইরফান বলেছে এ বাড়ির একটা বড় ঝাড়বাতি, দুটো প্লাস্টারের সিংহ আর ওদের ইউনিটের দুটো ঘোড়া গত ক'দিনে চুরি হয়েছে।'

'সে তো তাদের ইউনিটের লোকই চুরি করেছে।'

'আমি বিশ্বাস করি না।'

'আপনার বিশ্বাস-অবিশ্বাসে কিছুই আসে যায় না। জমিদার বাড়ির জিনিস চুরি করার মতো ছিঁচকে চোর নই আমরা। আমাদের একটা মান সম্মান আছে।'

'ইউনিটের কে চুরি করেছে?'

'কেন কমেডিয়ান গুলগুল্লা! হেরোইনের নেশা করার মতো যথেষ্ট পয়সা সিনেমাঅলারা ওকে দেয় না, তাই ও চুরি করে।'

শিবলী বললো, 'আমরা তো ভেবেছিলাম দাগুবাবু চুরি করে।'

শিবলীর কথা শুনে মুশকো একটু হাসলো—'গুলগুল্লা প্রথমে আমাদের ব্লাফ দিয়েছিলো দাগুর কথা বলে। দাগু জানি না কিভাবে টের পেয়ে গেছে এটা গুলগুল্লার কাজ। ও হাতে-নাতে ধরার জন্য সুযোগ খুঁজছিলো। যে জন্যে গুলগুল্লা আমাদের বলেছে দাগু ওকে বিরক্ত করেছে। থানাকে বলে যেন চুরির জন্য ওকে জেলে দিই।'

নিকোলাস স্যার বললেন, 'থানার সঙ্গেও তোমারদের তাহলে সম্পর্ক আছে!'

'আমরা যে ব্যবসা করি—থানার সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখতেই হয়।'

'ব্যাবসাটা কিসের?' জানতে চাইলেন নিকোলাস স্যার।

'ড্রাগসের। হেরোইন, হ্যাসিস—এইসব।'

'গুদামটা নিশ্চয়ই পীরের মাজারে?'

'তাই। জানলেন কী করে?' মুশকোর মুখে হাসি, চোখে বিস্ময়।

'আমার ছেলেদের অবজার্ভেশন রিপোর্টে দেখলাম কোন হেকিম সাহেবের ওষুধের গুদাম। অথচ এ তল্লাটে কোন হেকিমি দাওয়াখানা আছে বলে শুনি নি। তাই খটকা লেগেছিলো।'

'মন্দিরের পাশে ভাঙা ঘরের একটাতে তালা দেখেও নিশ্চয়ই খটকা লেগেছে?'

'হ্যাঁ, ছেলেদের অবজার্ভেশন রিপোর্টে দেখেছি।'

'জমিদার বাড়ির বাগানে মানুষের আনাগোনার চিহ্ন দেখেও নিশ্চয়ই খটকা লেগেছে?'

'তা লেগেছে—। তোমরা কী করে জানো এসব?'

'জানা কি খুব কঠিন কাজ! আজ সন্ধ্যার পর সিনেমা কোম্পানির ডিরেক্টরের সঙ্গে

যখন কথা বলছিলেন তখন যে পেছনে মুনসী বসেছিলো টের পাননি?'

'কোন্ মুনশী?'

'কেন গুলগুল্লা! মুনশী মেহেরুল্লাহর খান্দানের ছেলে মুনশী হেদায়েতুল্লাহ!'

'গুলগুল্লা কেন তোমাকে এসব কথা বলতে যাবে?'

'বারে! হাত খালি থাকলেও বাকিতে নেশার জিনিস দিই, এটুকু খবর সে দেবে না?'

নিকোলাস স্যার এবার একটু অপ্রস্তুত হলেন— 'তার মানে তোমরা জানতে আজ রাত আমরা এ বাড়িতে আসবো?'

'সে জন্যেই তো তৈরি হয়েছিলাম।'

নিকোলাস স্যার কোন কথা বললেন না। মুশকো এবার কর্কশ গলায় বললো, 'মাস্টার সাহেব নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন আপনি যে এতক্ষণ মিথ্যে কথা বলেছেন, সেটা আমার অজানা নয়।'

নিকোলাস স্যার কোন কথা বললেন না।

মুশকো এবার ধমক দিয়ে বললো, 'এসপিকে আপনি আমাদের সম্পর্কে বলতে গিয়েছিলেন। ঠিক কি না বলুন?'

নিকোলাস স্যার চুপ করে রইলেন।

মুশকে আবার বললো, 'কেন আপনি আপনার ছেলেদেরকে আমাদের পেছনে লেলিয়ে দিয়েছেন?'

মাথা তুলে শান্ত গলায় নিকোলাস স্যার বললেন, 'তোমরা ক্রিমিনাল। তোমারা দেশের শত্রু।'

'তার মানে আপনাদের সঙ্গে আমাদের যুদ্ধ!' মুশকোর গলায় উপহাস--- 'আফসোস, কোনো সৈন্যবাহিনী আপনাদের মদদ দিতে আসবে না।'

'এসপি কাল সকালেই আসবেন পুরো ফোর্স নিয়ে।'

'তার আগেই আমরা গুদাম খালি করে এখানকার ঘাঁটি গুটিয়ে ফেলবো।'

'আমাদের কী করবে?'

'সঙ্গে নিয়ে যাবো জামানত—হিসেবে।'

'নিতে চাও আমাকে নাও। এই বাচ্চা ছেলে দুটোকে ছেড়ে দাও। রান্টুকে যেভাবে মেরেছে আমার ভয় হচ্ছে ওর নার্ভ ছিঁড়ে গেছে।'

'বাচ্চা হলেও এরা কেউটের বাচ্চা। নার্ভ ছিঁড়লে আমার কিছু করার নেই। এর জন্য আপনার ছেলের অবাধ্যতাই দায়ী।'

পাশের ঘর থেকে হন্তদন্ত হয়ে একটা লোক এসে মুশকোকে বললো, 'ওস্তাদ বড় কর্তা আসছেন, আপনাকে যেতে বলেছে।'

মুশকো ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো। লোকটাকে জিজ্ঞেস করলো 'মাল তোলা শুরু করেছিস?'

'করেছি। আরো লোক লাগবে। নইলে রাতের ভেতর সব সরানো যাবে না।'

মুশকো আমাদের পাশের লোকগুলোকে বললো, 'তোরা সব তাহলে গুদামে চলে

যা। এগুলো এখানে থাকুক পড়ে। বড় কত্তা এসে নিশ্চয়ই দেখতে চাইবেন। ওপরের দরজায় তালা দিয়েছিস তো?'

মুখোশ পরা একজন মাথা নেড়ে বললো, 'দিয়েছি ওস্তাদ।'

'তাহলে যা, আর দেরি করিস না।' এই বলে মুশকো দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেলো।

তিনজন একা হতেই পালাবার একটা প্রচণ্ড ইচ্ছা আমাদের পেয়ে বসলো। নিকোলাস স্যার বললেন, 'শিবলী, তোমার হাতটা আমার হাতের কাছে আনতে পারো কি-না দেখো তো চেষ্টা করে।'

শিবলী বললো, 'আমার পেছনে বাঁধা হাত দুটো সামনে নিয়ে আসতে পারবো।'

কথাটা আমারও মনে হলো। শিবলী নিয়মিত যোগ ব্যায়াম করে। আমরা না পারলেও কাজটা ও পারবে ব্যায়াম করার সময় দেখেছি—মাঝে মাঝে মনে হয় ওর শরীরে বুঝি কোন হাড় নেই।

মিনিট দুয়েকের মধ্যেই শিবলী শরীরটাকে গোল করে পেছনে মোড়া হাত দুটোর ভেতর গলিয়ে দিলো। দড়ি বাঁধা হাত দুটো ওর সামনে চলে এলো। দেখতে ও আমার চেয়ে ছোট বলে বাঁধনটা বেশি শক্ত ছিলো না। দাঁত দিয়ে ও আর নিকোলাস স্যার দুজনে মিলে গিঁট খুলে ফেললো। তারপর দ্রুত হাতে ও আমাদের বাঁধন খুলে দিলো।

ঘরটার দুদিকে দরজা ছিলো। মুশকো যে দরজা দিয়ে বেরিয়েছে আমরা তার উল্টো দরজা দিয়ে বেরুলাম। সামনে দেখি ঘুটঘুটে অন্ধকার। নিকোলাস স্যার বলেন, 'শিবলী, হারিকেনটা নিয়ে এসো।'

হরিকেন আনার পর অন্ধকার কিছুটা দূর হলো। সামনে একটা সুড়ঙ্গের মতো। আমাদের দাঁড়াতে কোনো অসুবিধে হচ্ছিলো না। তবে নিকোলাস স্যার মাথা নুইয়ে হাঁটছিলেন। বললেন, 'সুড়ঙ্গের শেষ মাথা নিশ্চয়ই বাগানের কোনো জায়গা দিয়ে বেরিয়েছে।'

কিছুদূর যেতেই দেখি সুড়ঙ্গটা দু'ভাগ হয়ে গেছে। পকেট থেকে চক বের করে শিবলী দুটোর মুখে ট্র্যাকিং সাইন আঁকলো। কোনও স্কাউট আমাদের অনুসরণ করলে যাতে বুঝতে পারে আমরা কোনদিকে গেছি। মিনিট দশেক পর আবার ভাগ হয়ে গেলো সুরঙ্গটা। এবার সমানে তিন ভাগ। ঝটপট মার্ক দিয়ে একটা ধরে আমরা হারিকেন হাতে রীতিমতো দৌড়াতে লাগলাম। কান খাড়া রেখেছি সামনে বা পেছনে কোনো শব্দ হয় কি না শোনার জন্য। ভাগ্য ভালো এখনো ওরা টের পায়নি।

হঠাৎ মনে হলো সুড়ঙ্গটা ইংরেজি অক্ষর 'ইউ'র মতো একটা বাঁক নিয়েছে। কত বছর যে এখানে কেউ পা দেয়নি পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিলো। বিচ্ছিরি ভ্যাপসা একটা গন্ধ। একটা দুটো ছুঁচো চিক চিক করে ছুটে বেড়াচ্ছিলো। দেয়ালগুলো ঠাণ্ডা ভেজা। কোথাও রীতিমতো ঘাম জমেছে দেয়ালের গায়ে। সামনে যতো এগুচ্ছিলাম মনে হলো সুড়ঙ্গটা ঢালু হয়ে নিচের দিকে নেমে গেছে। আর ভ্যাপসা দমবন্ধ করা গন্ধটা আরো ভারি হচ্ছে। একসময় হারিকেনের আলো নিভে যাওয়ার দশা হলো।

নিকোলাস স্যার বললেন, 'আর সামনে এগুনো যাবে না। কার্বনডাই-অক্সাইড জমেছে। চল অন্য টানেল ধরে এগুই।'

মোড়ের কাছে এসে যে গর্তে ঢুকেছিলাম—সংকেত এঁকে সেখানে চিহ্ন পাল্টে দিলাম। অর্থাৎ আমরা দু'নম্বর টানেলে ঢুকবো।

এবারের টানেলটা আগের চেয়ে বড়। নিকোলাস স্যার মাথা সোজা করেই হাঁটছিলেন। হারিকেনটা ওঁর হাতে, আমরা দুজন পেছনে। কিছুদূর গিয়ে চাপা গলায় তিনি বললেন, 'এ টানেলটায় লোকজন চলা ফেরা করে।'

অল্প কিছুদূর যেতেই একটা ঘরে এসে ঢুকলাম। ঘরের দুদিকের দরজার জায়গা দিয়ে দুটো টানেল দু'দিকের চলে গেছে। সামনে দোয়ালের গায়ে কেরোসিন কাঠের কতগুলো প্যাকিং বাক্স। কাছে গিয়ে দেখলাম বাক্সগুলো খালি, গায়ে কালো ছাপ মারা লেখা—'গ্লাস, হ্যাণ্ডেল উইথ কেয়ার।' নিকোলাস স্যার বললেন, 'বোধহয় শিশি বোতল জাতীয় কিছু এনেছিলো।'

আমি বললাম, 'এসব বাক্সে করেই হয়তো মাল পাচার করে। বাইরে একটা ছাপ থাকলে সুবিধা।'

নতুন টানেলে ঢুকে নিকোলাস স্যার মৃদু হেসে আলতোভাবে আমার পিঠ চাপড়ে দিলেন—'ঘাড়ের ব্যাথাটা কি এখনো খুব বেশি?'

দম বন্ধ করে সুড়ঙ্গের ভেতর বেরোবার পথ খুঁজতে গিয়ে ব্যাথার কথা কখন ভুলে গেছি। মনে হচ্ছিলো বছরের পর বছর অন্ধকার পথ খুঁজে বেড়াচ্ছি। একবার মনে হলো যদি এখান থেকে আর বেরোতে না পারি। সারা শরীর আতঙ্কে শিউরে উঠলো। শিবলী আমার হাত ধরেছিলো। ফিস্‌ফিস্ করে বললো, 'কী হলো?'

ভয়ের কথা শিবলীকে বলা যাবে না। বলালম 'শীত করছে।'

টানেলটা কিছুদূর গিয়ে আবার দু'ভাগ হয়ে গেছে। নিকোলাস স্যার থমকে দাঁড়ালেন। কোন দিকে যাবেন ভাবছেন, এমন সময় একটু দূরে মানুষের গলা শোনা গেলো। লক্ষ্য করে দেখলাম বাঁ দিকের টানেলের মাথায় সামান্য আলোর আভাস। হারিকেনের আলোটা একেবারে কমিয়ে দিলেন নিকোলাস স্যার। আমরা তিনজন নিঃশব্দে বাঁদিকের টানেলে ঢুকলাম।

গজ দশেকের মতো যেতেই দেখি ডান দিকে একটু ভেতরে বড় একটা ঘরের মতো। খোলা দরজা দিয়ে ভেথরে জ্বালানো হ্যাজাকের আলোর কিছুটা বাইরে এসেছে। বেশ কয়েকজন মানুষের গলা শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু কিছুই বোঝা যাচ্ছিলো না।

পা টিপে আমরা দরজার দিকে আরেকটু এগুলাম। এবার কথা বোঝা গেলো। কফ জড়ানো গলা কি বললো বুঝলাম না। ওর জবাবে অচেনা কর্তৃত্বসম্পন্ন গলা বললো, 'না না, সঙ্গে নেয়া যাবে না। ওই তিনটেকে এখানেই নিকেশ করে রেখে যাবি। ফালতু বোঝা বইতে পারবো না।'

আমাদের তিনজনের কারো বুঝতে এতটুকু অসুবিধে হলো না ওরা কাদের 'নিকেষ' করার কথা বলছে। শিবলী আমার হাতে মৃদু চাপ দিলো। নিকোলাস স্যার অন্ধকারে কাঁধে হাত রেখে আশ্বস্ত করলেন। এমন সময় হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এসে একটা লোক হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, 'সর্বনাশ হয়েছে কত্তা। স্কাউট ছোঁড়াগুলো শুধু বাড়িটা ঘিরে রাখেনি, মাজার আর মন্দিরও ঘিরে ফেলেছে। পাঞ্জা বলছে, নৌকোয় এখন মাল

তোলা যাবে না।'

চিলের মতো চিৎকার করে কত্তা বললো, 'পাঞ্জার পিঠের চামড়া দিয়ে আমি ডুগডুগি বানাবো। ক'টা পুঁচকে ছোঁড়াকেও শায়েস্তা করতে পারছে না? মাজারে কি আমাদের লোক কম পড়ছে? বল, ধরে সব ক'টাকে সাবড়ে দিতে।'

'যাই কত্তা।' হন্তদন্ত গলা চলে গেলো।

কফ জড়ানো গলা বললো,'আমি বলছিলাম, এখন এসব খুনোখুনির মধ্যে না গেলেই ভালো হতো। মালগুলো ঠিক মতো.....'

বাধা দিয়ে কত্তা বললো 'আমাকে জ্ঞান দিতে এসো না। কি করতে হবে আমি ভালো বুঝি। যাও, দাড়ি পরে মাজারে গিয়ে ওই ছোঁড়াগুলোকে সামলাও গে।'

পায়ের শব্দ শুনে বুঝলাম কফ জড়ানো গলা চলে গেলো।

কত্তা এবার কাকে যেন বললো, 'ওই টিকটিকি তিনটাকে এখানে নিয়ে আয় দুরি।'

'আনছি কত্তা'—বলে দুরি ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

আমরা এবার রীতিমতো প্রমাদ গুনলাম। ওরা যদি টের পায় আমরা পালিয়েছি টানেলের সবগুলোর মুখ বন্ধ করে দেবে। একবার মনে হলো জানাজানি হওয়ার আগে আরেকবার বেরোবার চেষ্টা করি, আবার ভাবলাম কত্তার কথা থেকে আরো কিছু জানা যেতে পারে। ঠিক তখনই একজন এসে বললো, 'কত্তা পুলিশ এসে গেছে।'

'পুলিশ? বলছিস কী তুই?' আগের মতো চেঁচিয়ে উঠলো কত্তা—'পুলিশ আসবে কোত্থেকে? থানায় মাসে মাসে টাকা দেয়া হয় কী জন্যে? সত্যি সত্যি পুলিশ দেখেছিস, না পুলিশের পোশাক পরা বজ্জাত স্কাউটগুলোকে দেখেছিস?'

'পাগলা পীরের কিরে ওস্তাদ, ওগুলো পুলিশ।'

'পীর আবার কোথায় পেলি, বড় যে কিরে কাটছিস? চিনলি কী করে পুলিশ?'

'জিপে করে এসেছে কত্তা। দুটো জিপ বোঝাই।'

'এক্ষুণি যা, তিন আর পাঁচ নম্বর রাস্তার মুখ বন্ধ করে দে।' মন্দিরে বোমা ফাটিয়ে পুলিশগুলোকে ওদিকে নিয়ে যা। দক্ষিণের রাস্তা যেভাবে হোক খোলা রাখতে হবে।'

'যাচ্ছি কত্তা।' বলে লোকটা চলে গেলো।

তখনই আরেকজন এসে ঢুকলো। বললো, 'টিকটিকি তিনটা পালিয়েছে কত্তা।'

'তোরা এসব কী বলছিস? সবাই মিলে আমাকে পাগল করে ফেলবি দেখছি। শিগগির সব কটা রাস্তার মুখে পাহারা বসা। নওলাকে বলে দিয়েছি তিন আর পাঁচ বন্ধ করে দিতে। যেভাবে হোক বজ্জাত তিনটাকে আমি চাই। আমার পেটে লাথি মেরেছে ওগুলো। নিজের হাতে আমি ওদের শায়েস্তা করবো।'

অবশেষে মুক্তি

এখানে আর থাকা যাবে না। নিকোলাস স্যার আমাদের হাত ধরে টানলেন। যে পথে এসছিলাম সে পথে কিছুদূর গিয়ে যে টানেলটায় আগে ঢুকিনি সেটার ভেতর ঢুকলাম। হারিকেনের আলো বাড়িয়ে নেয়া হয়েছে। লক্ষ্য করলাম এদিকের টানেলটা ধীরে ধীরে ওপরের দিকে উঠে গেছে।

মিনিট পাঁচেকের মতো হাঁটার পর হঠাৎ চাপা কোলাহলের শব্দ শুনলাম। মনে হলো বহুদুর থেকে আসছে। শব্দ লক্ষ্য করে দ্রুত পা চালালাম। যত কাছে যাচ্ছিলাম, উত্তেজনাও তত বাড়ছিলো। তবে কী আমরা বেরোবার পথ পেয়ে গেছি?

কিছুদূর যাওয়ার পর আবার একটা ঘরে ঢুকলাম। এ ঘরটায় অনেকগুলো বস্তা রাখা। কাছে গিয়ে দেখলাম শুকনো কতগুলো ছোট ছোট গাছে বোঝাই হয়ে আছে বস্তাগুলো।

নিকোলাস স্যার এসে গাছের শুকনো পাতা শুঁকে একটামাত্র শব্দ বললেন, 'গাঁজা।' বস্তার পরিমাণ দেখে মনে হলো বেশ কয়েক মণ গাঁজা হবে। আমার হঠাৎ জোসেফের অবজার্ভেশনের কথা মনে হলো। নিকোলাস স্যারকে ফিস্ ফিস্ করে বললাম, 'আমরা বোধ হয় মাজারের কাছাকাছি কোনো জায়গায় আছি।'

নিকোলাস স্যার মাথা নেড়ে সায় জানালেন। আমরা যেদিকে দিয়ে ঘরে ঢুকেছিলাম তার উল্টো দিকে একটা মই রয়েছে দেয়ালে হেলান দেয়া। কাছে গিয়ে দেখলাম, ওপরে যাওয়ার সিঁড়ি ওটা। হারিকেন হাতে নিকোলাস স্যার আগে উঠলেন, তারপর আমরা।

উঠে চারপাশে তাকালাম। এটাও দরজা বন্ধ একটা ঘর। পাশের ঘরে উত্তেজিত কথাবার্তা হচ্ছে। পরিষ্কার শুনতে পেলাম, কফ কজানো গলা। জোরে জোরে বলছে—'ভাইসব, আপনারা উত্তেজিত হবেন না। জেরে কথা বলবেন না। এখানে যিনি শুয়ে আছেন, যাঁর মাজার শরীফ রয়েছে এখানে, তিনি একজন জিন্দাপীর। এমন কাজ আপনারা করবেন না যাতে তিনি গোস্বা হন। আপনারা এখানে ভিড় করবেন না। রাত অনেক হয়েছে। আপনারা বাড়ি যান। যাও বাবারা তোমরাও বাড়ি যাও।'

বাইরে বেশ কোলাহল। কোলাহলের ভেতর থেকে একটা গলা শুনে আমরা সবাই ভীষণ রোমাঞ্চিত হলাম। নিকোলাস স্যার শক্ত করে আমার হাত ধরে শুধু বললেন,

'জোসেফ।'

জোসেফকে লোকজনের কোলাহলের ভেতর বলতে শুনলাম, 'আমরা আপনার হুজুরাখানা দেখতে চাই। কিছু যদি না থাকে, সেখানে আমাদের যেতে দিচ্ছেন না কেন?'

নিকেলাস স্যার দরজা খোলার চেষ্টা করলেন। কোন লাভ হলো না। দুটো দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। এবার শওকতের গলা শুনলাম—'ভাইসব, আপনারা কেউ যাবেন না। আপনারা নিজের চোখে দেখে যান এখানে কী হচ্ছে।'

হঠাৎ নিকোলাস স্যার চেঁচিয়ে বললেন, 'শওকত আমরা এখানে, ভেতরে এসে দরজা খোল।'

আমি আর শিবলী জোরে জোরে দরজায় ধাক্কা দিতে লাগালাম। কোলাহল বেড়ে গেলো।

কফ জড়ানো গলা চ্যাঁচাতে লাগলো, 'ভালো হবে না বলছি, আল্লার গজব পড়বে, কেয়ামত হয়ে যাবে।'

ওর কথার মাঝখানেই অনেকগুলো পায়ের শব্দ শুনলাম। ঝনাৎ করে শেকল খোলার শব্দ হলো।

'স্যার আপনারা কোথায়?'

দরজা খুলতেই শওকতকে সামনে পেয়ে দুহাতে ওকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন নিকোলাস স্যার। শেখর ছুটে এস আমাকে জড়িয়ে ধরলো—'রান্টুদা' বলে।

বাইরে তাকিয়ে দেখি জোসেফ আর মুন্না কালো দাড়িওয়ালা একটা লোককে জড়িয়ে ধরেছ। শিবলী ছুটে গিয়ে ওর দাড়ি ধরে একটা টান দিতেই দাড়িটা হাতে চলে এলো। বললো, দ্যাখ রান্টু, সেই শয়তান কুকুরটা, আমাদের মাটির তলার ঘর বেঁধে রেখেছিলো।'

বাইরে থেকে ফারুক চেঁচিয়ে বললো, 'জো ভাই, আমারা দুটোকে ধরেছি।'

লোকজনের ভীড়ের ভেতর আমাদের ছেলেরাও অনেকে এসেছে। সবার পরনে ইউনিফর্ম। আনন্দ আর উত্তেজনায় সবার চোখ মুখ চকচক করছে। শিবলী কালো দেড়েকে ধমক দিলো—'তাকায় কী রকম করে দেখ না! দেবো এক থাপ্পড়।'

মুশকো কালো শয়তানকে চিনতে পেরে আমার ভীষণ রাগ হলো। এতক্ষণ উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠায় ঘাড়ের ব্যাথার কাথা মনে ছিলো না। লোকটাকে দেখে ব্যাথাটা যেন বেড়ে গেলো। কাছে গিয়ে শিবলীর বদলে আমিই ওর গালের ওপর একটা চড় বসিয়ে দিলাম।

নিকোলাস স্যার ঘাড় ধরে বললেন, 'রান্টুকে যেমন মেরেছিলে দেবো নাকি ওরকম এক ঘা বসিয়ে?'

'না নিকোলাস, আইন নিজের হাতে তুলে নেয়া ঠিক নয়।'

কথা শুনে তাকিয়ে দেখি পুলিশ অফিসারের পোশাক পরা এক ভদ্রলোক, আমাদের দিকে তাকিয়ে মিট মিট হাসছেন।

নিকোলাস স্যার এগিয়ে গিয়ে ওঁর সঙ্গে হাত মেলালেন—'আরে এসপি সাহেব যে!

তোমার তো সকালে আসার কথা।'

'তাই তো কথা ছিলো!' এসপি হেসে বললেন, 'তোমার ছেলেরা আমাকে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে দিলে তো।'

নিকোলাস স্যার হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে বললেন 'নিচে কী রকম শেয়ালের মতো গর্ত খুঁড়েছে দেখেছো? অনেকগুলো 'শয়তান নিচে রয়ে গেছে।'

মৃদু হেসে এসপি বললেন, শেয়ালকে কী করে গর্ত থেকে বের করতে হয় আমরা জানি। শুধু এই কালো দেড়েটা ফস্কে যাচ্ছিলো। ভাগ্যিস আমাদের আসার আগে তোমার ছেলেরা ওদের ঘেরাও করে ফেলেছিলো।'

লাজুক হেসে নিকোলাস স্যার বললেন, 'বার বার শুধু তোমার ছেলে, তোমার ছেলে বলছো কেন। ওরা তো তোমারও ছেলে। সব যে তোমারই স্কুলের ছেলে।'

হা হা করে হেসে এসপি বললেন, 'এমন হীরের টুকরো ছেলেদের নিয়ে আমরা সবাই গর্ব করতে পারি। এবার তাঁবুতে চলো। চা খাওয়াবে।'

হাত কড়া পরিয়ে মাজারের কালোদেড়ে কেয়ার টেকার আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের জিপে তোলা হলো। মাজারে কড়া পুলিশ পাহারা বসলো। আমরা সবাই হই চই করে জমিদার বাড়ির দিকে রওনা হলাম।

সিংহ দরজার কাছে আমাদের সঙ্গে ইরফান ভাইর দেখা। বাকি স্কাউটরাও ছিলো সেখানে। বোঝা গেলো আমাদের জন্যেই সবাই অপেক্ষা করছে। ইরফান ভাই স্যারকে বললেন, 'নিকোলাস, সবাই মিলে নাচ ঘরে বসলে কেমন হয়? বড় ফরাস আছে, পেতে দিচ্ছি। চা-টারও ব্যবস্থা করা যাবে।'

'চায়ের সঙ্গে টা-ও হবে নাকি?' হেসে বললেন এসপি—'তাহলে তো চমৎকার হয়। ইরফান সত্যি কাজের ছেলে। কী বলো নিকোলাস?'

'আমি কি বলেছি ও কাজের নয়। দেখো না এই রাতে ও কত কী আয়োজন করে।' এই বলে নিকোলাস স্যার মুখ টিপে হেসে ইরফান ভাইর দিকে আড়চোখে তাকালেন।

ইরফান ভাইও হাসলেন—'চলো ছেলেরা, সবাই ওপরে চলো। আমরা আজকের তিন নায়কের অভিযানের গল্প শুনবো।'

আমাকে আর শিবলীকে নিয়ে মাজার থেকেই এক রকম লোফালুফি শুরু হয়েছিলো। ঘাড়ের ব্যথা ভুলে আমিও গা ছেড়ে দিয়েছি। নাচঘরে গিয়ে বসার পর সেই লোফালুফি থামলো। তবে ঠেলে ঠুলে সবাই আমাদের দুজনকে সামনে বসিয়ে দিলো, যেন আমরা অন্য কোনো গ্রহ থেকে এসেছি।

সিনেমা কোম্পানির হিরো স্বপন, হিরোইন সুমিত্রা, প্রোডাকশন ম্যানেজার দাশুবাবু থেকে শুরু করে টি বয় পিচ্চি পর্যন্ত এসেছে। আসেনি শুধু কমেডিয়ান গুলগুল্লা।

শিবলী জিজ্ঞেস করলো, 'গুলগুল্লা কোথায় ইরফান ভাই?

ইরফান ভাই কাষ্ঠ হেসে বললেন, 'আমি জানি তুমি কী বলবে। ও আমাদের ক্যামেরাম্যানের সঙ্গে ঝাড়বাতিটা আনতে গেছে। বলেছি আজ রাতের মধ্যে সব ফেরত পেলে পুলিশকে জানাবো না।'

এসপি গম্ভীর হওয়ার ভান করে বললেন, 'কই নিকোলাস, তোমার ইনভেস্টিগেশন

রিপোর্ট আমাদের সামনে পেশ করো।'

নিকোলাস স্যার মৃদু হেসে বললেন, 'রিপোর্ট আমি দেবো না, দেবে রান্টু আর শিবলী। রান্টু, তোমার ব্যাথাটা কমেছে? বলতে পারবে?'

'পারবো স্যার।' বলে ক্যাম্পিং-এর প্রথম দিনের সন্দেহ থেকে শুরু করে কিছুক্ষণ আগে মাজার থেকে বেরিয়ে আসার পুরো বিবরণ দিলাম। এরই মধ্যে চা খাওয়া হয়ে গেছে, সেই সঙ্গে টোস্ট বিস্কুট, ডিমের অমলেট আর কলা। রাত তখন প্রায় দেড়টা বাজে। মাত্র দুইঘন্টা মাটির নিচে বন্দি ছিলাম। অথচ মনে হচ্ছিলো কত দিন ধরে সবার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন। সবাইকে ভীষণ ভালো লাগছিলো। এমন কি শাহেদ পর্যন্ত আস্তে করে কাঁধে হাত রেখে সমবেদনার গলায় বলছিলো, 'তোর খুব লেগেছে, তাই না রান্টু?'

আমার বলার পর নিকোলাস স্যার বললেন, 'এবার জোসেফ বলবে ওদের অভিযানের কথা।'

নাকের ডগায় নেমে আসা চশমাটা ঠিক করে অতি রাশভারি জোসেফ লাজকু হেসে বললো, 'নিকোলাস স্যার তো আমাকে আর আরিফকে বাইরে রেখে রান্টু শিবলীকে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। আমরা তাকিয়ে আছি জমিদারবাড়ির দিকে, কোথাও যদি অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়ে। কিছুক্ষণ পর দেখি ওরা তিনজন ছাদের রেলিং-এর ধারে দাঁড়িয়ে। নদীর দিকে আঙ্গুল তুলে রান্টু বোধ হয় কী যেন দেখাচ্ছিলো। তারপর পুব দিকে দেখালো—রান্টু তো বলেছে আপনাদের। হঠাৎ আমরা লক্ষ্য করলাম পেছনে থেকে কয়েকজন লোক খুব সাবধানে ওদের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। একবার ভাবলাম হুইসেল বাজাবো, আরিফ বললো, দেখি না কী হয়। লোকগুলো ওদের তিনজনকে জাপটে ধরলো। তারপর আর কিছু দেখা গেলো না।

আমরা একবার ভাবলাম গোটা ট্রুপকে এলার্ট করে দেবো। পরে আবার ভাবলাম এতে করে জানাজানি হয়ে যাবে। ক্রিমিনালরা পালিয়ে যেতে পারে। আমরা দুজন তখন জমিদারবাড়ির ভেতরে ঢুকলাম। ইরফান ভাইর কাছে গিয়ে সব বললাম। তিনি সঙ্গে সঙ্গে উঠে এলেন। ঠিক তখনই সিঁড়ির কাছে 'ইক্' বলে রান্টুর গলা শুনলাম। ধপ করে একটা শব্দ, তারপর সব কিছু চুপ। আলো জ্বেলে সিঁড়ির কামরায় এলাম। ছাদে গেলাম। দোতলার ঘর দেখলাম, কোথাও কেউ নেই। তখনই সিদ্ধান্ত নিলাম আর দেরি করা ঠিক হবে না। ইরফান ভাই আর আরিফ চলে গেলো গেন্ডারিয়া স্টেশনে এস পি সাহেবকে টেলিফোন করার জন্য। আমি গোটা ট্রুপকে ভাগ করে এক ভাগকে জমিদারবাড়ি ঘিরে ফেলার দায়িত্ব দিয়ে, এক ভাগকে পাঠালাম পুরোনো মন্দিরে, আরেক ভাগ নিয়ে আমি গেলাম মাজারে।

'মন্দির আর মাজার কেন সনেদহজনক মনে হয়েছে আপনারা রান্টুর কাছে শুনেছেন। মাজারে গিয়ে শুনি হুজুর ঘুমাচ্ছেন। দেখা করা যাবে না। হুজুরাখানায় যাওয়ার হুকুম নেই। আমাদের মাজারে যেতে দেখে গ্রামের কিছু লোকও সঙ্গে এসেছিলো। ওদেরকেও দেখলাম আমাদের পক্ষে, আবার কয়েকজনকে দেখলাম, হুজুরকে বিরক্ত না করার পক্ষে। আমরা বললাম, দেখা না করে এখান থেকে নড়বো না। আসলে আমরা পুলিশের জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

'সময়মতো পুলিশ না এলে আমরা বিপদেই পড়তাম। গ্রামের লোকদের বেশির ভাগ দেখলাম কালোদেড়েকে সমর্থন করছে।' এই বলে জো থামলো।

ইরফান ভাই বললেন, 'গ্রামের লোকদের দোষ দিয়ে কী হবে! ওদের এত বছরের বিশ্বাস এভাবে নষ্ট হয়ে যাবে, তাই ওদের খারাপ লাগছিলো। দাগুবাবু যখন গুলগুল্লার কথা আমাকে বললো, তখন আমাদের স্বপনই তো চটে গিয়ে বলেছিলো, গুলগুল্লা শরীফ খান্দানের ছেলে। ও কখনো এমন কাজ করতে পারে না। আমি যখন বললাম, পুলিশকে খবর দেয়া হয়ে গেছে, ওরা এলে কী হবে আমি জানি না, কাউকে ধরলে আমি ছাড়াতেও যাবো না। তখন গুলগুল্লার হাউমাউ কান্না—আমাকে বাঁচান। আমি সব এনে দেব। তখন অবশ্য স্বপনই বলেছে জিনিস ফেরত দিলে গুলগুল্লাকে পুলিশে দেয়া হবে না। কী লজ্জার কথা বল তো।'

নিকোলাস স্যার বললেন, 'ও খুব আজেবাজে নেশা ধরেছিলো। নেশাখোরদের কি কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকে! ভাবো, ওরই জন্যে আমরা গুণ্ডাদের হাতে ধরা পড়লাম।'

আমি দাগুবাবুকে বললাম, 'এবার আপনি বলুন রোজ সন্ধ্যেয় মুরগি কেনার কথা বলে আপনি কোথায় যেতেন।'

দাগুবাবু লাজুক হেসে বললো, 'গুলগুল্লাকে আমার প্রথম থেকে সন্দ হয়েছিলো। ওর খরচের হাত সব সময়ই বড়। এখানে স্যুটিং-এ আসার পর আমাদের কারোই মন ভালো না, কত রকম কী শোনা যাচ্ছে, দেখা যাচ্ছে, অথচ গুলগুল্লা দেখি মহা ফুর্তিতে আছে। অচেনা সব লোকের সঙ্গে কী খাতির ওর, মনে হয় অনেকদিনের চেনা। রান্টুদের আগেই আমি মন্দিরের পাশের ঘরে ঘোড়ার নাদি দেখেছিলাম। গুলগুল্লাকে বাজিয়ে দেখার জন্য বলেছিলাম, ইশ ঘোড়া দুটো এবারে চুরি হয়ে গেলো, মুভিটোন কোম্পানি ওদের খুনের দরিয়া ছবির জন্য ডেলি একশ টাকা করে ঘোড়া খুঁজেও কোথাও পাচ্ছে না। ডিরেক্টর নসরত আলী সেদিন বললেন, দশ হাজার হলেও দুটো ঘোড়া তিনি কিনতে চান। গুলগুল্লা ফ্যাল করে বললো, বলেন কি, আমি যে শুনলাম দুটো ঘোড়ার দাম নাকি আটশ টাকার বেশি হয় না। আমি বললাম, জানতে হবে তো জিনিসটা কার কখন বেশি দরকার। যার দরকার নেই সে কেন এত দাম দিয়ে কিনবে।

'এর পরদিন সকালে গুলগুল্লা আমাকে জিজ্ঞেস করে মুভিটোনের খুনের দরিয়া ছবির প্রোডাকশন ম্যানেজার কে, লোক কেমন—এইসব কথা। রাতে গুলগুল্লা যখন মাজারে যাচ্ছিলো, তখন আমার একটা মানত আছে বলে ওর সঙ্গে গেলাম। মাজারে আসা লোকদের একজনকে গুলগুল্লা একটু আড়ালে নিয়ে বললো, দুরি সাহেব আপনি আমাকে ঠিক দাম বলেননি। দুটোর বাজার দর দশ হাজারের কম না। তারপর কী কথা হয়েছে, শুনতে পাইনি। একটু পরে গুলগুল্লা উত্তেজিত হয়ে এসে বললো চলুন দাগুবাবু, আপনার কাজ হয়েছে তো!

'আমি তক্কে তক্কে ছিলাম হাতে নাতে প্রমাণসহ ধরবো। যে জন্যে স্বপন সাহেব যখন বললেন, ইউনিটের কেউ চুরি করেছে তখন আমি ইচ্ছে করেই কথাটা ঘুরিয়ে দিলাম যাতে গুলগুল্লা সাবধান হতে না পারে।'

আমি বললাম, 'যাই বলেন দাগুবাবু, মোরগ পোলাওর কথা বলে আপনি নিজেই

আমাদের সন্দেহের তালিকায় পড়ে গিয়েছিলেন। সুমিত্রাদি মোরগ পোলাওর নাম শুনতে পারেন না, আর আপনি বললেন, তিনি মোরগ পোলাও খেতে চেয়েছেন।'

আঁতকে উঠে হিরোইন সুমিত্রা বললো, 'ও—মা ছি ছি, দাশুবাবু এমন কথা কী করে বললেন! শুনেই যে আমার গা গুলোচ্ছে। আমার নামে এসব রটানো কি ঠিক হলো আপনার!'

সুমিত্রার গলায় অভিমান দেখে দাশুবাবু জিব কাটলো, 'ওটা আমার মস্ত ভুল ছিলো। আসলে আগের ছবির হিরোইন রোজ মোরগ পোলাও খেতেন কি-না, তাই প্রায় সন্ধ্যে বেলা বাইরে কোথাও গেলে আমাকে গ্রামে ছুটতে হতো মুরগি কেনার জন্যে।'

নিকোলাস স্যার বললেন, 'এবার আমরা উঠবো।'

শুনে সবাই ব্যস্ত হয়ে উঠলো। 'তাই তো, বাচ্চা ছেলেরা সব, কত রাত জেগে আছে,' বলে সবাই পারলে আমাদের কোলে পিঠে করে তাঁবুতে পৌঁছে দেয়।

এসপি যাওয়ার সময়ে বলে গেলেন, 'তোমরা আমাকে নেমতন্ন করোনি ছেলেরা, আমি কিন্তু তোমাদের গ্রাণ্ড ক্যাম্প ফায়ার দেখতে আসবো।'

এবার আমাদের হইচই করার পালা—'নিশ্চয়ই আসবেন। আমরা ঠিকই নেমতন্ন করতাম। আমরা ভেবেছি নিকোলাস স্যার আগেই বলেছেন—।'

অন্তহীন আনন্দ

পরদিন সকালে বিউগল বাজলো দু'ঘন্টা দেরিতে। বাইরে তখন ঘন কুয়াশা। কে যেন বললো, 'এখনো তো ভোর হয়নি। এত জলদি বিউগল বাজালো কেন?'

ঘড়িতে দেখি আটটা বাজে।

ঘুম ঘুম চোখে হাত মুখ ধুয়ে রুটিন মতো পতাকা উত্তোলন তাঁবু পরিদর্শন সবই হলো। পিটি করার সময় ঘুমটুম সব চলে গোলো। আরিফটা যা ভালো—সেদিন মোটে কুড়ি মিনিট পিটি করালো।

পিটি শেষ করে তাঁবুতে এসে ব্রেকফাস্টের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছি সবাই। এর পরই যার যার মতো ট্রেনিং-এ যেতে হবে। নিকোলাস স্যার এসে বললেন, 'ইরফানের কাণ্ড দেখ! আমাদের আজ দুপুর আর রাতে—দুবেলার জন্যেই খাওয়ার নেমতন্ন করে বসে আছে। বললাম, একবেলা করো, কিছুতেই শুনলো না। তার ওপর বললো ব্রেকফাস্টের পর সবাইকে স্যুটিং দেখতে যেতে। অবজার্ভেশন ট্রেনিং ওখানেই হবে, যেভাবে রান্টু

শিবলীরা কাল করেছে। কি বলো তোমরা?'

এমনভাবে কথাটা বললেন নিকোলাস স্যার—অনিচ্ছাসত্ত্বেও যেন ইরফান ভাইর অনুরোধ রাখতে হচ্ছে। আরিফও গম্ভীর মুখে বললো, 'এত করে যখন বলছেন, রাজী হয়ে যাই আমরা—কী বলো।'

আরিফের কথা শুনে ছেলেদের ভেতর হাসির হুল্লোড় বয়ে গেলো।

দুপুরে ইরফান ভাইদের ওখানে খাওয়া সেরে তাঁবুতে এসে বিশ্রাম নিতে গিয়ে সবাই ঘুমিয়ে একেবারে কাদা হয়ে গেলো। চারটার সময় ঘুম জড়ানো চোখে পেট্রল লিডাররা সবাইকে ডেকে তুললো।

আমরা যখন বিকেলে চায়ের আয়োজন করছি তখন ঘটলো আরেক অবাক কাণ্ড। স্কুল থেকে দলবল নিয়ে হাজির বুড়ো হেডমাস্টার ব্রাদার জেমস। সঙ্গে ফিলিপ্স, ব্রাদার পিটার, নিখিল স্যার, রহমতুল্লা স্যার এমনকি ঘন্টাবুড়ো ভিনসেন্টও। মোটাসোটা বিশাল দেহ ব্রাদার পিটার যা করেন—আমাদের 'গুড আফটারনুন ব্রাদার পিটার' শুনে মিট মিট করে হেসে এক একজনকে কোলে তুলে শূন্যে ছুঁড়ে আবার লুফে নিলেন।

লাজুক হেসে নিখিল স্যার বললেন, 'এসপি নিজে এসেছেন স্কুলে। তখন শুধু আমি আর রহমতুল্লা স্যার ছিলাম। ব্রাদার জেমসকে ডেকে সব বললেন। সন্ধ্যে বেলা নাকি খবরের কাগজের সব লোকজন আসবে। এসপি বলে দিয়েছেন সন্ধ্যের আগে নিকোলাস স্যারের ছেলেদের কেউ যেন বিরক্ত না করে। সারাদিন ওদের বিশ্রাম। আমরা থাকতে না পেরে আগেই চলে এলাম।'

নিকোলাস স্যার এগিয়ে গিয়ে নিখিল স্যারকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন—'কী যে খুশি লাগছে নিখিল স্যার, আপনারা সবাই এসেছেন। ওরা শুধু আমার ছেলে হবে কেন, আপনারও তো ছেলে। আপনি কী চমৎকার গান শিখিয়েছেন ওদের! এ ক'দিন যারা ক্যাম্প ফায়ারে এসেছে সবাই বলেছে।'

ব্রাদার জেমস মৃদু হেসে বললেন, 'আমরা কিন্তু ক্যাম্প ফায়ার না দেখিয়া যাইব না!'

ব্রাদার ফিলিপ্স অভিমান ভরা গলায় বললেন, 'আমারে কেউ কিসু কইতাসে না, একটা থ্যাংক্‌সও দিতাসে না। আমি না কইলে ক্যাম্পিং-এ যে আহন লাগতো না-এ কথা কেউ মনে রাখে নাই।'

শওকত গিয়ে ধরলো ব্রাদার ফিলিপ্সকে—'ও ব্রাদার, পিঠের ব্যাথা কি সেরে গেছে?'

ব্রাদার ফিলিপ্স রেগে যাওয়ার ভান করলেন—'চুপ, চুপ, এই হগল কথা হাটবাজারে কইতে হয় না।'

শিবলী মুখ কাচুমাচু করে নিখিল স্যারকে বললো, 'স্যার আমরা ফাংশনে স্টেজে ওঠার চান্স পাবো তো? খনুদা বলছিলো আমাদের নাকি আপনি আর স্টেজে উঠতে দেবেন না?'

নিখিল স্যার বললেন, 'খনুকে আমি ক্লাস শুরু হলে সাতটা ডিটেন স্লিপ দেবো। শুনেছি সব—ও কী করেছে। তোমরা পুরো তিনঘন্টা ফাংশন করবে।'

নিকোলাস স্যার আঁতকে উঠলেন—বলেন কি নিখিল স্যার! আমাদের মোটে এক ঘন্টা দশ মিনিটের প্রোগ্রাম করার কথা! এত আইটেম কোথায় পাবো?'

নিখিল স্যারের মুখে হাসি, গলায় রাগের ভান—'বললেই তো হলো না, এক ঘন্টা দশ মিনিট করবো। পুরো তিন ঘন্টা অনুষ্ঠান চাই! কেন, ক্যাম্প ফায়ারে কি তিন ঘন্টা অনুষ্ঠান হয় না?

ছেলেরা সবাই— 'থ্রি চিয়ার্স ফর নিখিল স্যার' বলে 'হিপ হুররে' দিলো।

ব্রাদারের নামেও ইয়েল দেয়া হলো। সে এক হৈ হৈ রৈ রৈ ব্যাপার।

রাতে ইরফান ভাই নিজে এসে সবাইকে খেতে নিয়ে গেলেন। আটটার মধ্যে খাওয়া শেষ। মাঠে এসে দেখি আরেক কাণ্ড। গ্রাম ভেঙে লোক এসেছে কাম্প ফায়ার দেখার জন্য। খুব ডিসিপ্লিন মেনে গোল হয়ে বসেছে। আমাদের কয়েকজন অবশ্য তাঁবুতে ছিলো। ওরাই গ্রামের লোকদের বসিয়েছে। নিকোলাস স্যারের তাঁবুর সামনে বসে আছেন খোদ এসপি। তাঁর সঙ্গে বেশ কয়েকজন সাংবাদিক। কারো কারো হাতে ফ্লাশগানওয়ালা ক্যামেরা। স্যারকে দেখে এসপি বললেন, 'তোমার জিনিস তাঁবুর ভেতর রাখা আছে।'

ট্রুপলিডার আরিফের নির্দেশে পেট্রলগুলো যে যার জায়গায় বসে পড়লো। মাঝখানে কাঠের স্তুপ। সবাই আগুন জ্বালাবার অপেক্ষা করছে।

পূব দিকে থেকে মশাল হাতে জোসেফ প্রথম মাঠে ঢুকলো। কাঠের স্তুপের কাছে দাঁড়িয়ে মশাল উঁচু করে বললো, 'আমি এসেছি পূর্ব দিকে থেকে, হাজার বছরের প্রাচীন সভ্যতা আর জ্ঞানের বার্তা নিয়ে।'

পশ্চিম দিক থেকে মশাল হাতে এলো শওকত—'আমি এসেছি পশ্চিমের দেশ থেকে, আধুনিক বিজ্ঞানের জয়যাত্রার বাণী নিয়ে।'

দক্ষিণ দিক থেকে মশাল হাতে ঢুকলো রকিবুল—'আমি এসেছি দক্ষিণের মহাসমুদ্র থেকে, অন্তহীন অভিযান আর আবিষ্কারের আহ্বান নিয়ে!'

উত্তর দিক থেকে এলো দিলীপ—'আমি এসেছি উত্তরের তুষারধবল সুউচ্চ হিমালয় থেকে, শত বিপদে অনড় অবিচল থাকার প্রেরণা নিয়ে।'

চারজন একসঙ্গে তাদের মশাল শুকনো কাঠের স্তুপে ছোঁয়ালো। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো আগুন। আরিফ গম্ভীর গলায় বললো, 'এই আগুনের শিখার মতো আমাদের দেশপ্রেম, দেশের মানুষের জন্য আমাদের ভালোবাসা উজ্জ্বল হয়ে উর্ধ্বে উঠুক, সবাইকে আলোকিত করুক। আমাদের ভেতর যত দুঃখ আর গ্লানি আছে সব কিছুই পুড়ে ছাই হয়ে যাক।'

স্কাউটরা সবাই কোরাস গান ধরলো, 'ব্যর্থ প্রাণের আবর্জনা পুড়িয়ে ফেলে আগুন জ্বালো।'

এরপর শুরু হলো পেট্রলগুলোর অনুষ্ঠান প্রদর্শনের পালা। গ্রাণ্ড ক্যাম্প ফায়ারে সবাই তাদের সেরা অনুষ্ঠানগুলোই করে। আমরা করলাম আমাদের প্রথম দিনের হাসির নকশাটি। সব অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর নিকোলাস স্যার হাসিমুখে ঘোষণা করলেন—'এবার আমাদের ছেলেরা আপনাদের সামনে একটি সত্য ঘটনার অভিনয়

করবে। বেশি পুরনো ঘটনা নয়, মাত্র গত রাতেই ঘটেছে। আমার নিজেরও পার্ট আছে এতে। আমরা এর নাম দিয়েছি— অপারেশন বাগানবাড়ি। আশা করি গ্রামবাসী এবং সাংবাদিক বন্ধুরা এটি উপভোগ করবেন।'

নিকোলাস স্যারের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দর্শকদের ভেতর এমন হুল্লোড় আর খুশির ঢেউ উঠলো যে থামতে পুরো দেড় মিনিট সময় লাগলো।

শওকত ঘোষণা করলো—'প্রথম দৃশ্য নিকোলাস স্যারের তাঁবু, সময় রাত দশটা।'

শুরু হলো এক অভাবনীয় নাটকের দৃশ্য। আসল ঘটনার চরিত্ররাই অভিনয় করছে নিজ নিজ ভূমিকায়। শুধু গুণ্ডাদের অভিনয় করার জন্য আমাদের ছেলেরা সাদা আলখাল্লা আর কঙ্কালের মুখোশ পরে নিয়েছিলো। এগুলো পুলিশ সিজ করেছিলো। নিকোলাস স্যারের অনুরোধে ক্যাম্প ফায়ারে আসার সময় এসপি সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন।

গ্রামের কয়েকশ মানুষ রুদ্ধশ্বাসে দেখলো সেই বাস্তব অভিনয়ের দৃশ্য। আমার ঘাড়ে মারার কথা মুখোশপরা দিলীপের। ওকে পই পই করে বলেছিলাম, আস্তে মেরো, এখনো ব্যথায় টন টন করছে জায়গাটা। বাস্তব অভিনয় করতে গিয়ে ও এমন জোরে মারলো যে দ্বিতীয় দফা জ্ঞান হারাবার দশা হলো আমার। সাংবাদিকদের ফ্লাশ যে কতবার জ্বলেছিলো মনে নেই।

শেষে মাজারের দৃশ্যে এসপি নিজে এসে যোগ দিলেন। ততক্ষণে হল্লা আর হাততালির ঝড় শুরু হয়ে গেছে। ফলে নাচঘর পর্যন্ত টানা গেলো না। যদিও আমাদের প্ল্যান ছিলো নাচঘরে শেষ হবে আমাদের নাটক। ইরফান ভাইদেরও পার্ট থাকবে ওতে। ওটা বাদ দিয়েও এক ঘন্টার ওপর হয়েছিলো অপারেশন বাগানবাড়ির অভিনয়।

সব শেষে এসপি নিজে ঘোষণা করলেন, 'স্কাউটদের ফিফথ ঢাকা ট্রুপ এমন দুঃসাহসিক কাজ করেছে—যার জন্যে ধরা পড়েছে স্মাগলারদের এক ভয়ঙ্কর শক্তিশালী দল, সরকারের পক্ষ থেকে তাদের কিছু উপহার দিতে চাই আমি।' এই বলে তিনি নিকোলাস স্যারের তাঁবুর ভেতর থেকে বের করে আনলেন মস্তো বড় একটা কাপ। দু'হাতে উঁচু করে ধরে তিনি বললেন, 'ট্রুপ লিডার আরিফকে আমি অনুরোধ করবো এটি গ্রহণ করার জন্য।'

এবার আমাদের পালা। আবার হাততালির ঝড় উঠলো। ঝড় থামার পর এসপি বললেন, 'আরো দুটি ছোট উপহার আছে—উলফ পেট্রলের রান্টু আর প্যান্থার পেট্রলের শিবলীর প্রচণ্ড সাহস, পর্যবেক্ষণ আর বুদ্ধিমত্তার জন্য। আমি ওদের দুটো সোনার মেডেল দেবো। কোথায় তোমরা রান্টু, শিবলী। এগিয়ে এসো।'

এসপি যখন আমাদের মেডেল পরাচ্ছিলেন তখন গোটা ট্রুপ ওয়ার্ল্ড জাম্বুরিতে শেখা ইয়েল দিয়ে আমাদের অভিনন্দন জানালো—'চিঙ্গালিং চিঙ্গালিং চিং চিং চো, ভূম্যারাং ভূম্যারাং ভুম ভ্যাম ভো, চিঙ্গালি ভূম্যারাং চি পু পা, বয়স্কাউট বয়স্কাউট রাঃ, রাঃ, রাঃ।'

আমরা দুজন শুধু বললাম, 'ধন্যবাদ।'

এরপর ইরফান ভাই বললেন, আমাদের জন্য তাঁর কী উপকার হয়েছে। আমাদের দুজনের পুরস্কার তিনি পরে দেবেন অনুষ্ঠান করে। জমিদার বাড়ির কেয়ার টেকারও

অভিনন্দন জানালো আনুষ্ঠানিকভাবে।

ক্যাম্প ফায়ারের আগুনের শিখা তখনো উজ্জ্বল হয়ে জ্বলছে। সবার মুখে লাল ছায়া কাঁপছে। মনে হলো আমরা সবাই এক বাড়ির ছেলে। আমাদের সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা সব এক।

বাড়ির কথা মনে হলো আমার। বাবার কথা মনে হলো। বাবা কাল খবরের কাগজে নিশ্চয়ই দেখবেন সব। দিদাকে ডেকে দেখাবেন।

চিরকাল ভাগ্যের হাতে মার খাওয়া বাবার জন্য আমার বুকের ভেতরটা দুঃখ আর আনন্দ মেশানো অদ্ভুত এক অনুভূতিতে ভরে গেলো।

www.facebook.com/groups/BoiLoverspolapan